জাগতিক ও আধ্যাত্মিক

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সোমনাথ মন্দির, ঐতিহাসিক দরজা ও স্বর্ণমন্দির ইতিহাসের আলোয়	৪
জীবনের আরেক অধ্যায়-প্রথম পর্ব	৯
জীবনের আরেক অধ্যায়-দ্বিতীয় পর্ব	১২
জীবনের আরেক অধ্যায়-তৃতীয় পর্ব	১৮
ঝুলনযাত্রা তত্ত্ব	২৫
প্রসঙ্গ গোস্বামী তুলসীদাসজী-প্রথম পর্ব	৩৩
প্রসঙ্গ গোস্বামী তুলসীদাসজী-দ্বিতীয় পর্ব	৪৬

॥সোমনাথ মন্দির, ঐতিহাসিক দরজা ও স্বর্ণমন্দির- ইতিহাসের আলোয়॥

শ্রাবণমাসের প্রথম সোমবার আজকে, শিবের বার, তাই একটু ইতিহাসের নিরিখে দেখার চেষ্টা সোমেশ্বর মহাদেবের মন্দির সম্পর্কে।

সোমনাথ মন্দিরের আরাধ্য দেবতা শিব সোমেশ্বর মহাদেব নামে পরিচিত। পুরাণ অনুসারে, সত্যযুগে সোমেশ্বর মহাদেব ভৈরবেশ্বর, ত্রেতাযুগে শ্রাবণিকেশ্বর ও দ্বাপর যুগে শ্রীগলেশ্বর নামে পরিচিত ছিলেন। চন্দ্রদেবের বিবাহ হয়েছিল দক্ষের সাতাশটি কন্যার সাথে যাঁরা জ্যোতিষে খ্যাত সাতাশটি নক্ষত্র হিসেবে। চন্দ্রদেব তাঁর স্ত্রী রোহিণীর প্রতি অত্যধিক আসক্তি বশত তাঁর অন্য ছাব্বিশ স্ত্রীকে উপেক্ষা করতে থাকেন। এই ছাব্বিশ জন ছিলেন দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। এই কারণে দক্ষ তাঁকে ক্ষয়িত হওয়ার অভিশাপ দেন।

প্রভাস তীর্থে চন্দ্র শিবের আরাধনা করলে শিব তাঁর অভিশাপ অংশত নির্মূল করেন। এরপর ব্রহ্মার উপদেশে কৃতজ্ঞতাবশত চন্দ্র সোমনাথে একটি স্বর্ণ শিবমন্দির নির্মাণ করেন। পরে রাবণ রৌপ্যে, কৃষ্ণ চন্দনকাষ্ঠে এবং রাজা ভীমদেব প্রস্তরে মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন।

কথিত আছে, সোমনাথের প্রথম মন্দিরটি খ্রিস্টের জন্মের আগে থেকে বিদ্যমান ছিল। ৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন গুজরাটের বল্লভীর যাদব রাজারা।

৭২৫ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধের আরব শাসনকর্তা জুনায়েদ তাঁর সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে এই মন্দিরটি ধ্বংস করে দেন। ৮১৫ খ্রিস্টাব্দে গুজ্জর প্রতিহার রাজা দ্বিতীয় নাগভট্ট সোমনাথের তৃতীয় মন্দিরটি নির্মাণ করান। এই মন্দিরটি ছিল লাল বেলেপাথরে নির্মিত সুবিশাল একটি মন্দির।

১০২৪ খ্রিস্টাব্দে মামুদ গজনি আরেকবার মন্দিরটি ধ্বংস করেন। ১০২৬ থেকে ১০৪২ খ্রিস্টাব্দের মাঝে কোনো এক সময়ে গুজ্জর পরমার রাজা মালোয়ার ভোজ ও সোলাঙ্কি রাজা আনহিলওয়ারার প্রথম ভীমদেব আবার মন্দিরটি নির্মাণ করান। এই মন্দিরটি ছিল কাঠের তৈরি।

কুমারপাল (রাজত্বকাল ১১৪৩-৭২) কাঠের বদলে একটি পাথরের মন্দির তৈরি করে দেন। ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির সৈন্যবাহিনী পুনরায় মন্দিরটি ধ্বংস করে। হাসান নিজামির তাজ-উল-মাসির লিখেছেন, গুজরাটের রাজা করণ পরাজিত হন, তাঁর সেনাবাহিনী পলায়ন করে, “পঞ্চাশ হাজার নীরিহ মানুষকে তরবারির আঘাতে নিহত করা হয়” এবং “বিজয়ীদের হাতে আসে কুড়ি হাজারেরও বেশি ক্রীতদাস ও অগণিত গবাদি পশু।” ১৩০৮ খ্রিস্টাব্দে সৌরাষ্ট্রের চূড়াসম রাজা মহীপাল দেব আবার মন্দিরটি নির্মাণ

করান। তাঁর পুত্র খেঙ্গর ১৩২৬ থেকে ১৩৫১ সালের মাঝে কোনো এক সময়ে মন্দিরে শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের সুলতান প্রথম মুজফফর শাহ আবার মন্দিরটি ধ্বংস করেন। মন্দিরটি পুনর্নির্মিত হলে ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের সুলতান মাহমুদ বেগদা আবার এটি ধ্বংস করে দেন।

কিন্তু এবারও মন্দিরটি পুনর্নির্মিত হয়। ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব মন্দিরটি ধ্বংস করেন। আওরঙ্গজেব সোমনাথ মন্দিরের জায়গায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এই মসজিদে হিন্দু শাস্ত্র-ভিত্তিক মোটিফগুলি সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েনি।

পরে ১৭৮৩ সালে পুণের পেশোয়া, নাগপুরের রাজা ভোঁসলে, কোলহাপুরের ছত্রপতি ভোঁসলে, ইন্দোরের রানি অহল্যাবাই হোলকর ও গোয়ালিয়রের শ্রীমন্ত পাতিলবুয়া সিন্ধের যৌথ প্রচেষ্টায় মন্দিরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তবে মূল মন্দিরটি মসজিদে পরিণত হওয়ায় সেই জায়গায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করা যায় নি। মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ধ্বংসাবশেষের পাশে।

স্বাধীনতার আগে, প্রভাস পত্তন ছিল দেশীয় রাজ্য জুনাগড়ের অংশ। জুনাগড়ের ভারতভুক্তির পর ১৯৪৭ সালের ১২ নভেম্বর ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জুনাগড়-পুনর্গঠনের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে উপযুক্ত নির্দেশ দিতে আসেন। সেই সময়ই তিনি সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের আদেশ দেন।

১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে ধ্বংসাবশেষ সাফ করে ফেলা হয়। আওরঙ্গজেব নির্মিত মসজিদটি কয়েক মাইল দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৫১ সালের মে মাসে কে এম মুন্সির আমন্ত্রণে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ মন্দিরের শিলান্যাস করেন। রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর ভাষণে বলেন, “যেদিন শুধুমাত্র এই ভিত্তির উপর এক অসামান্য মন্দিরই নির্মিত হবে না, বরং প্রাচীন সোমনাথ মন্দির ভারতের যে ঐশ্বর্যের প্রতীক ছিল, সেই ঐশ্বর্য ভারত ফিরে পাবে, সেইদিনই আমার দৃষ্টিতে সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মিত হবে।” তিনি আরও বলেন, “ধ্বংসের শক্তির চেয়ে যে সৃষ্টির শক্তি মহৎ তার প্রতীক সোমনাথ মন্দির।”

রাজেন্দ্র প্রসাদ ও কে এম মুন্সি মনে করেছিলেন, এই মন্দির পুনর্নির্মাণ স্বাধীনতার ফলশ্রুতি এবং অতীতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে হওয়া অবিচারের প্রতিকার।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম গুজরাতে সোমনাথ মহাদেবের মন্দির। সেই মন্দিরেই সম্প্রতি ঘটেছে এক অবাক করা কাণ্ড। মন্দিরের নীচে পাওয়া এল এক তিলতলা ভবনের অস্তিত্ব। আইআইটি গান্ধীনগর ও প্রত্নতত্ত্ব দফতরের গবেষণায় এই রহস্য উন্মোচিত হয়েছে।

আইআইটি গান্ধীনগর ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ২০১৭ সালে গবেষণা করে জানতে পারে দেশের কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসের প্রতীক জ্যোতির্লিঙ্গ সোমনাথ মহাদেবের মন্দির চত্বরে একটি তিন তলা এল-আকারের ভবন মাটির নীচে চাপা পড়েছে।

মাটির নীচে একটি তিনতলা ভবনের উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে প্রথম তলটি আড়াই মিটার, দ্বিতীয় তলটি ৫ মিটার এবং তৃতীয় তলটি ৩০ মিটার গভীরতার। এই মুহূর্তে, যেখানে সোমনাথে আসা তীর্থযাত্রীদের সিকিউরিটি চেক করা হয়, সেখানেও এমনি একটি ভবন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সোমনাথের প্রভাস পাটন, গোলক ধামের সামনের দিকে গীত মন্দির থেকে হিরণ নদীর তীর পর্যন্ত মাটির অভ্যন্তরে একটি পাকা ভবন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও দিগ্বিজয় গেট থেকে সর্দার প্যাটেলের মূর্তির কাছে একটি কংক্রিট নির্মাণের সন্ধান পাওয়া যায়, যা আগে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

বলা হয় গুজরাতের ভেরাওয়ালে অবস্থিত সোমনাথ মন্দির স্বয়ং চন্দ্রদেব তৈরি করেছিলেন ঋকবেদ, স্কন্দপুরাণ এবং মহাভারতেও এই মন্দিরের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। ইতিহাসের একাধিকবার বৈভবশালী সোমনাথ মন্দিরের ওপর আক্রমণ হানার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই সোমনাথের অস্তিত্ব মুছে ফেলার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, পুনর্নির্মাণের মধ্যে দিয়ে থেকে গিয়েছে সোমনাথ।

তখনকার দিনে সোমনাথ মন্দিরের দরজা ছিল সম্পূর্ণ চন্দন কাঠের। এত বড় দরজা ছিল যে একটা হাতি এক দিক দিয়ে ঢুকতে পারত, আর একটা হাতি এক দিক দিয়ে বেরোতে পারত। তাহলে বোঝা যাচ্ছে কত বড় দরজা ছিল!!! দরজার মাঝখানে মাঝখানে সোনার পাত গোল করে আটকানো ছিল যাতে দরজা মজবুত হয়। মোঘল আমলে সোমনাথ মন্দিরের এই দরজা ও প্রচুর সোনা লুঠ হয়ে যায়। কিন্তু পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিত সিং ভীষণ যুদ্ধ করে নাদির শাহের হাত থেকে ওই দরজা ও সোনা উদ্ধার করে বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দিরে দেবার জন্য নিয়ে যান।

বারানসীর পুরোহিত সমাজ এগুলো গ্রহণ করলেন না। তাঁরা বললেন যে, এসব অচ্ছ্যুত হয়ে গেছে। গুরু নানক প্রবর্তীত শিখ ধর্মতে ছুঁতমার্গ এতটা প্রকট নয়,শিখরা অনেকটা সংস্কার মুক্ত। তখন পাঞ্জাবে স্বর্ণমন্দির তৈরি হচ্ছিল। ঐ মন্দিরের গেটে চন্দন কাঠের দরজা বসানো হল এবং সেই ফিরিয়ে আনা সোনা দিয়ে মন্দিরের চূড়াটি মুড়ে দেওয়া হল। সেই থেকে মন্দিরের নাম হল 'স্বর্ণমন্দির'।

কথিত আছে ষোড়শ শতাব্দীতে চতুর্থ শিখ গুরু রাম দাস সাহেবের উদ্যোগেই এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। তবে মন্দির নির্মানের প্রথম দিন থেকেই এই মন্দির কিন্তু স্বর্ণাবৃত ছিল না। মন্দির নির্মানের প্রায় দুই শতাব্দী পরে মহারাজা রঞ্জিত সিংহ ১৮৩০ সালে প্রায় ১৬২ কেজি সোনা দিয়ে এই মন্দির আবৃত করেছিলেন। তখনকার দিনে যার দাম পড়েছিল প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা।সঙ্গে দিয়েছিলেন ঐ চন্দনকাঠের দরজা।

তথ্যসূত্র : বিভিন্ন পুরাণ, ঐতিহাসিক তথ্য ও স্বামী পরমানন্দজীর প্রবচন

॥জীবনের আরেক অধ্যায়॥

প্রথম পর্ব:-

******

বরাবরই আমি বই পড়তে ভালোবাসি। বি এ পড়ার সময় আবার ডে স্টুডেন্ট হোমের মেম্বার ছিলাম, তার সাথে ছিল বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরি, আমার কলেজের লাইব্রেরি-প্রচুর বইয়ের সংগ্রহ এসব জায়গায়, তাই গোগ্রাসে চলছে বই পড়া, আনন্দের শেষ নেই আমার।ক্রমে এম এর প্রস্তুতি শুরু হোল।ক্রমে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে চাকরি পাওয়া, অরবিন্দ ভবনের লাইব্রেরির মেম্বার হওয়া এবং তারপরে বিয়ে।ততদিনে মন যেন কী এক অমোঘ বস্তুর খোঁজে মেতে উঠেছে। টিফিনের সময়, মন ভালো থাকলে, মন খারাপ থাকলে, মন বিক্ষিপ্ত থাকলে গিয়ে বসে থাকি অরবিন্দ ভবনে বহুক্ষণ ধরে। যখন বেরোই ওখান থেকে, মনে যেন এক শীতল শান্তির প্রলেপ অনুভূত হয়। বুঝতে পারিনা কী হচ্ছে, কিন্তু বড়ো ভালো লাগে এই প্রাণের প্রশান্তি।

বিয়ের পরে বাড়িতে বরের বইয়ের তাক গোছাতে গিয়ে একটা ছেঁড়া বই প্রাপ্তি, সেটুকু পড়ে এতো ভালো লাগলো, সেই বই কিনলাম। বইটা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা "পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ", সেই বই যেন একদম হাতে ধরে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিল অন্য এক জীবনের অধ্যায়ের মুখে। নিজে বেশ কয়েকবার পড়ে বরকেও পড়ালাম, সেও মুগ্ধ। এবারে আমার মাকে দিলাম পড়তে, একরকম জোর করে পড়ালাম তাঁকে। মা বরাবরই আচার বিচার নিয়ে, নিয়ম নিষ্ঠা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন, এর ওপরে ওঠা হয়নি তাঁর তখনো।তাই প্রথমবার পড়েই তিনি আপ্লুত, তিনিও বারবার পড়লেন, শেষে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনে যোগাযোগ করে দীক্ষা নিলেন তিনি আর আমার বাবা। তাঁরও জীবন পাল্টে গেল। কিন্তু দীক্ষা নেবার একবছরের মধ্যে তিনি মারা গেলেন।

সেদিন আরেকজনের কাছে শুনলাম তাঁরও বাবা দীক্ষা পেয়েছিলেন এক সিদ্ধ মহাত্মার কাছে, কিন্তু দীক্ষা নেবার দুবছরের মধ্যে দেহ রাখলেন। কেন এমন হয়? কেউ কেউ দীক্ষা পাওয়ার পরে বেশিদিন বাঁচেন না, কেউ কেউ দীক্ষা পেয়ে অসুস্থ হন।

আধার তৈরীর ব্যাপারে দেখেছি আমার পরিচিত এক ব্যক্তিকে যিনি বহুদিন ধরে কাউকে নিজের গুরু মনে করে তাঁকে স্মরণ করতেন, আশি বছরে তিনি সাক্ষাৎ পেলেন সশরীরে সেই মহাত্মার, দীক্ষা দেওয়ার আগে মহাত্মা বললেন যে তিনি জানেন ওই ব্যক্তির তাঁকে ঘিরে ভক্তি ও সমর্পণ। দীক্ষা হোল, সেই মহাত্মা নিজ পরিমণ্ডলে জানালেন যে ওই ব্যক্তি আর বেশিদিন বাঁচবেন না আর ওনাদের সিদ্ধ সাধক বংশ, কিন্তু ওনার ব্যাকুলতার জন্য দীক্ষা দিলেন, সত্যিই ইনিও দেহ রাখলেন এক বছরের মধ্যে। সেখানে একটু হলেও সেই ব্যক্তি শান্তি পেলেন দীক্ষা পেয়ে। বয়স্ক মানুষকে এই শান্তি দিতেও অনেক সময় সদ্গুরু দীক্ষা দেন, অনেকটা নামটা এনরোল হয়ে রইলো তাঁর কাছে আর কী!

এখন তো আবার আধার কার্ডই করছে ব্যক্তি পরিচয়ের জন্য সরকার থেকে। শাস্ত্র বলছে আধার তৈরী না হলে এমন হয়। কারণ দীক্ষার বীজ বা শক্তিপাত ধারণ করার উপযোগী হয়নি আধার, তাই অধিক শক্তি ধরতে না পেরে ফেটে যায়। আধার তৈরী করার জন্যই সাধনা লাগে, তারও প্রস্তুতি পর্ব আছে। এই প্রসঙ্গে সেই বাউল দেহতত্ত্বের গান আছে:

কাঁচা হাঁড়িতে রাখিতে নারিলি প্রেমজল
কাঁচা হাঁড়ি জলে দিলে
অমনি যাইবে গুলে গো
তখন লাগি যাবে লাগি যাবে বিষম গন্ডগোল।
করবি যদি পাকা হাঁড়ি
তবে চলে যাবি গুরুর বাড়ি রে ক্ষ্যাপা
সেথা প্রেম আগুনে সিদ্ধ হবি রূপে করবি ঝলমল।
গোসাঁই সদানন্দ ভেবে আউল
ক্ষেপা মনোহর তুই হবি কী বাউল রে
বলি ধান কুটিলে হবে চাউল, তুষ কুটিলে কিবা ফল।

আধার তৈরী না হলে ওই তুষ কোটার অবস্থা হয়, দেহ ঘটখানি লয় প্রাপ্ত হয়। সেই প্রস্তুতি পর্বের মধ্যেই কিন্তু পড়ে আমাদের পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগ। পতঞ্জলি ঋষি আটটি অঙ্গকে যম, নিয়ম, আসন,প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ধারনা, ধ্যান ও সমাধি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আটটি অঙ্গ বাইরে থেকে ভিতরের দিকে ক্রম তৈরি করে। প্রত্যেকটি অঙ্গের আবার কিছু কিছু ভাগ ও আলাদা ব্যাখ্যা আছে।

ভঙ্গি, আধুনিক যোগব্যায়ামে ব্যায়াম হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ, পতঞ্জলির সূত্রের মাত্র একটি অঙ্গ গঠন করে; তিনি শুধুমাত্র বলেন যে তারা অবিচলিত ও আরামদায়ক হতে হবে। মূল লক্ষ্য হল কৈবল্য, পুরুষের বিচক্ষণতা, সাক্ষী-সচেতন, প্রকৃতি থেকে আলাদা, জ্ঞানীয় যন্ত্র ও পুরুষকে তার ঘোলাটে কলুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

তাহলে কী বলে ভগবানকে নিবেদন করবো? দেহ যেটা আছে সেটা মলমুত্র রক্ত মাংসের খাঁচা যা কোনোই কাজে লাগে না, মন পরিপূর্ণ হয়ে আছে বিষয় আশয় চিন্তায়, কুচিন্তা নিয়ে, কু অভ্যাসে ভরা, প্রাণখানি শুধুই লোভে মত্ত হয়ে “দেহি দেহি” করছে জাগতিক জিনিসপত্র, কী তবে নিবেদন করবো প্রভুর চরণে, পরমের কাছে? এখানে হাত পাতবো কবিগুরুর কাছে। তাঁর ভাষাতেই বলবো:

“আমি কী ব’লে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণ মন॥
চিত্তে আসি দয়া করি নিজে লহো অপহরি,
করো তারে আপনারি ধন-আমার হৃদয় প্রাণ মন॥
শুধু ধূলি, শুধু ছাই, মূল্য যার কিছু নাই,
মূল্য তারে করো সমর্পণ স্পর্শে তব পরশরতন!

তোমারি গৌরবে যবে আমার গৌরব হবে
সব তবে দিব বিসর্জন-
আমার হৃদয় প্রাণ মন॥”

আবার সেটাই রামপ্রসাদ বলছেন জগন্মাতা কালিকা দেবীকে এভাবে:

আমার চেতনা চৈতন্য করে
দে মা চৈতন্যময়ী
তোর ভাব সাগরে ভেসে আমি
হব মা তোর পদাশ্রয়ী।
অজ্ঞান মোর স্বভাব থেকে,
তোর ভবে তুই নে মা ডেকে
জ্ঞানো চক্ষু মেলে দেখি
কেমন তুই জ্ঞানদাময়ী।
তোর ভাবের খেলা দিয়ে,
দে মা আমার যা কিছু সব
অভাব মিটিয়ে।
কৌতুহল মোর এ জীবনে,
নিয়ে নে মা তোর ও চরণে
মহানন্দে যাই চলে মা
মহানন্দে যাই চলে মা
হয়ে সর্ব রিপু জয়ী।

BANGL

অর্থাৎ সেই পরম চৈতন্যের দ্বারে শরণাগত হয়ে প্রার্থনা করতে হবে যাতে তিনিই তাঁর সেই অমূল্য পরশ চৈতন্য দিয়ে জগৎ চৈতন্যের বোধ আমার মধ্যে জাগরুক করে দেন যাতে তাঁকে আমি অনুভব করতে পারি। সেটা পাওয়ার জন্যই সব সাধনা, সেটা দিতে পারেন সদ্গুরু যিনি পরমাত্মার “চাপরাস” নিয়ে এসেছেন পৃথিবীতে জীবোদ্ধারের মহান ব্রত পালনার্থে।

চুরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করে যে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করেছি, সেটা তো তাঁকে পাবার জন্য। এই চুরাশি লক্ষ যোনির বিবরণ, সেটা বলবো পরের পর্বে।

॥দ্বিতীয় পর্ব॥

সৃষ্টিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শাস্ত্র বলছে যে পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর "ইচ্ছা"তেই সকল জীবের সৃষ্টি, তিনি নিজেকে এক থেকে বহুতে ব্যক্ত করে জগতের বিস্তার ঘটিয়েছেন,আবার তাঁর মধ্যেই বিলীন হবে সব- "বিষ্ণুসে সৃষ্টি, হরিমে লয়, ব্রহ্মপদ রহে অক্ষয়।" এবারে তাঁর "ইচ্ছামাত্রেণ" সৃষ্টি হোল একটা আত্মা, সেটা তিনি দিলেন পরমা প্রকৃতির হাতে, যিনি কালের চক্রে নিঃক্ষেপ করলেন সেই আত্মাকে। পরম তার দৃশ্যমানতাকে মাটি-জল-আগুন-বায়ু-আকাশ অর্থাৎ পঞ্চভূতে প্রকাশিত হতে মত্ত হলেন।

এবারে সেই আত্মার শুরু হোল যাত্রা সৃষ্টির ক্রমে যেখানে প্রথম সে এসে আশ্রয় নিল জলে। যেকোনো যোনীতে জীবজীবনের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু ঈশ্বরের আরাধনায় কাজে লাগা, তাই যে যে যোনিতে সে শ্রেষ্ঠরূপ প্রাপ্ত হয়ে ঈশ্বরের জন্য নিজেকে কাজে লাগাতে পারছে, সেই সেই যোনিকক্ষ পথ সে ছেড়ে আরো উন্নত যোনিকক্ষ পথে যেতে পারছে। ব্যাপারটা একটু বুঝে নেওয়া যাক।

পদ্মপুরাণ মতে-"চুরাশী লক্ষ যোনীতে জন্মের পর মানুষ জন্ম"....সে বিবরণ একটু দেখি কেমন:
আমরা সবাই জানি পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সঞ্চার হয়ে ছিল জলে এক কোষী এমিবা রূপ নিয়ে, এই সমগ্র জলচর জীবের রূপ হল-নয় লক্ষ।

এক কোষী জলচর জীব বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে যখন ঐ জলচরের জীবেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপে পূর্ণতা লাভ করে তখন ঐ জীবের জল জীবন থেকে মুক্তি। জলজীবনের শ্রেষ্ঠরূপটা হোল শঙ্খ, কারণ শঙ্খনাদ লাগে পরমেশ্বরের আরাধনায়।

এবার ঐ আত্মা জলকক্ষ পথ ছেড়ে প্রবেশ করে "বৃক্ষকক্ষ পথে"-কুড়ি লক্ষ রকম বৃক্ষজীবনে রূপ। সেখানে শ্রেষ্ঠ পুষ্পবৃক্ষজন্ম হোল পদ্ম, শ্রেষ্ঠ ফলবৃক্ষ হোল নারকোল আর শ্রেষ্ঠ পত্রবৃক্ষ হোল তুলসী। তুলসী জন্ম লাভ করলে তারপরে আর বৃক্ষকক্ষ পথে থাকতে হয়না।

তখন ঐ আত্মা এবার প্রবেশ করে "কীটকক্ষ পথে"-এগারো লক্ষ রকম কীটজীবনে রূপান্তর হতে হতে কীটজগতে শ্রেষ্ঠরূপ মৌমাছি বা মধুমক্ষিকা জন্ম লাভের পরে কীটকক্ষ পথ সমাপ্ত। কারণ মধু ওষধি এবং পরমেশ্বরের আরাধনায় লাগে।

এবারে ঐ আত্মা এবার প্রবেশ করে "পক্ষীকক্ষ পথে"-দশ লক্ষ রকম পক্ষীজীবনে রূপান্তর হতে হতে পক্ষীজগতে শ্রেষ্ঠরূপ হয় ময়ূররূপ ধরে। ময়ূরের পালক লাগে ঈশ্বরের ব্যাজনে এবং পরমেশ্বরের মুকুটের শোভা হিসেবে, অত্যন্ত শুভ মানা হয় ময়ূরের পালককে।

“পক্ষীকক্ষ পথ”শেষে এবারে ঐ আত্মা এবার প্রবেশ করে “পশুকক্ষ পথে”-ত্রিশ লক্ষ রকম পশুজীবনে রূপান্তর হতে হতে পশুজগতে শ্রেষ্ঠরূপ হোল গোজন্ম কারণ হিন্দু শাস্ত্রে গোমাতার গোটা শরীরেই বিভিন্ন দেবতার বাস, আবার তার দুগ্ধ লাগে খাদ্য হিসেবে, প্রসাদ হিসেবে ভোগে, গোচনা, গোবর পবিত্র করতে গৃহাঙ্গন আর গোমাতা মারা গেলে তার চর্ম দিয়ে তৈরী হয় শ্রীখোল যা ভজন কীর্তনে বাজে।

“পশুকক্ষ পথ” লাভের শেষে ঐ আত্মা এবার প্রবেশ করে “মানুষকক্ষ পথে”-চার লক্ষ রকম মানুষজীবনে রূপান্তর হতে হতে মানুষের জগতে শ্রেষ্ঠরূপ লাভের পর অর্থাত্ ঐ আত্মাটির পরমাত্মায় বিলীন হয়ে গিয়ে স্থায়ী “মুক্তি” লাভ করে।

ঐ আত্মার আর পূর্নজন্ম হয়না, জন্মমৃত্যুর কক্ষপথে আর থাকতে হয় না ,আর কোন ক্লেশ যাতনা বহন করতে হয় না ,কমপ্লিট “আনন্দ” পূর্ণ মানব মানবত্বে প্রতিষ্ঠিত “মহাত্মা” হয়ে যান। শাস্ত্রে একেই বলে “দেবত্ব লাভ” বা “ঈশ্বরত্ব লাভ।”

মানুষের প্রথম জন্মও মাতৃগর্ভে জলেই হয় খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দশমাস দশ দিনে এবং জন্মের এক বছরের মধ্যে আমরাও ঐ (9+20+11+10+30+4)=84 লক্ষ স্তর পার হয়ে চলে আসি:- তাই আমাদের মধ্যে ঐ 84 লক্ষ ধরনের বৃত্তি/সংস্কার বিরাজ করে কারন ঐ জীবন পার হয়ে হয়েই তো এসেছি। লালন ফকিরের গানে আছে:

জীব ম'লে যায় জীবান্তরে
জীবের গতি মুক্তি রয় ভক্তির দ্বারে,
জীবের কর্ম বন্ধন না হয় খণ্ডন
প্রতিবন্ধন কর্মের ফেরে॥
ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুত-ব্যোম
এরা দোষী নয় দোষী আদম,
বেহুঁশে খেয়ে গন্ধম
তাইতে এলো ভাবনগরে॥
আত্মা আর পরম-আত্মা
ত্রিসংসারে জগৎকর্তা,
ভুলে আত্মা জগৎকর্তা
লক্ষ যোনী ঘুরে মরে॥
গুরু ধরে জ্যান্তে ঘরে
বসাও গুরুর হৃদমাঝারে,
সিরাজ সাঁই এর চরণ ভুলে
লালন মিছে কেন বেড়াও ঘুরে॥

তারপর মানব কুলেতে জন্ম ৪লক্ষ বার। বনের মানুষ বনের মধ্যে তারা পশুসম খাবার খায় তাদের আত্ম-পর জ্ঞান নেই, চেতনা নিম্নস্তরে। তারপর পাহাড়িয়া জাতির জন্ম হয়- চেতনা একটু উত্তোলিত হোল-নাগা, কুকি, সাঁওতালি।তারপর জন্ম হয় অধম কুলে-এদেরও চেতনা নিম্নগামী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়। তারা দেবধর্ম মানেনা, অপকর্ম করে। মদ্য পান করে।তারপর শুদ্রকুলে জন্ম। যা কর্ম করে তা নিজেই ভোগ করে। কেউ অন্ধ, কেউ কানে শুনেনা, চেতনা অপরিশীলিত ইত্যাদি হয়। কারো স্বভাব ভাল হয় কর্মগুণে। তারপর জন্মায় বৈশ্য জাতি কুলে। কর্ম অনুযায়ি ফল ভোগ করে ওরা।তারপর ক্ষত্রিয়। কর্ম ফলে ফল ভাগি হয়।

অবশেষে ব্রাহ্মণকুলে জন্মায়। এখানে আর একাধিকবার জন্ম হয়না। উত্তম ব্রাহ্মণ জন্ম তার শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মজ্ঞান থাকলেই সে ব্রাহ্মণ। নিজের উদ্ধারে সে আত্মজ্ঞান লাভ করে। শুধু ব্রাহ্মণ কুলে জন্মালেই উদ্ধার হওয়া যায়না। যদি সে জ্ঞান লাভ করতে না পারে, অহংকার আর বাসনায় ডুবে থাকে তবে পুনরায় সে চুরাশিলক্ষ যোনি পদে ঘোরে। বারবার জন্মলাভে কষ্ট পায়। কারণ বাসনা বা আকাঙ্খা ত্যাগ হয়না। তাই কবিগুরুর ভাষায়:

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা,
শুধু আলো-আঁধারে কাঁদা-হাসা॥
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চ'লে যায়-
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা॥
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙা বল,
প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙা ফল,
ভাঙা তরী ধ'রে ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে-ভাঙা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়,
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে আধো-বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালোবাসা॥

BANGL

অশেষ বাসনার ভাঙ্গা বল নিয়ে ভাঙ্গা ফলই তো হবে, তাই না? কারণ বাসনা নিবৃত্তিই উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের কাজে লাগা উদ্দেশ্য নয়। স্রষ্টার কাজে লাগছে না। তাই ভক্তসাধিকা মীরাবাঈ বলছেন:

হ্যায় আঁখ ও জো শ্যাম কা দর্শন কিয়া করে
হ্যায় শিস জো প্রভু চরণ কো বন্দন কিয়া করে
বেকার ও মুখ হ্যায় জো রহে ব্যর্থ বাতো মে
মুখ ও হ্যায় জো হরি নাম কা সুমীরণ কিয়া করে
হীরে মোতি সে নেহি শোভা হ্যায় হাত কী

হ্যায় হাত জো ভগবান কা পূজন কিয়া করে
মর কর ভী অমর নাম হ্যায় উস জীব কা জগমে
প্রভু প্রেম মে বলিদান জো জীবন কিয়া করে।

চোখের সার্থকতা ঈশ্বর দর্শন করে, মাথা সার্থক ঈশ্বরের সামনে ঝুঁকিয়ে তার বন্দনা করলে, মুখের সার্থকতা যখন সে হরিনাম করে, হীরে মোতি নয়, হাতের শোভা যখন সে ঈশ্বরের পূজা সেবা করে আর সেই জীবন সার্থক যে প্রভুর প্রেমে নিজেকে বলিদান দেয়। তাই জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন এবং আমাদের সাধু সমাজ বলছে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বর লাভ। আর কোনো উপায় নেই যদিনা ভগবানের শরণাগত হয়, ভগবান কৃপা করেন সদ্গুরুরূপে এসে জীবোদ্ধার করে ।

আবার যে মুহূর্তে ঈশ্বরের নাম শুনে চেতনা হোল, সেই মুহুর্ত থেকে ঈশ্বর লাভের ব্যাকুলতা শুরু হোল। তার মানে মুক্তির রাস্তায় তুমি চলতে শুরু করলে। তাই তুলসীদাসজী বলছেন:

জিনকে হৃদয় হরি নাম বসে
তিন অর কা নাম লিয়া না লিয়া।
জিনকে দ্বার পর গঙ্গা বহে
তিন কূপ কা নীর পিয়া না পিয়া।
জিন কাম কিয়া পরমার্থ কা
তিন হাত সে দান দিয়া না দিয়া।
জিনকে ঘর এক সুপুত ভায়ো
তিন লাখ কুপুত ভয়া না ভয়া।
জিন মাতা পিতা কী সেবা করি
তিন তীরথ ব্রত কিয়া না কিয়া।
তুলসীদাস বিচার করে
কপটি কো মিত কিয়া না কিয়া।

BANGL

অর্থাৎ তুলসীদাসজীর মতে যার হৃদয়ে হরিনাম বসে, সে আর নাম না নিলে কিচ্ছু যায় আসেনা, যার দুয়ারে দিয়ে গঙ্গা বয়ে যায়, সে কুঁয়োর জল না খেলে কিচ্ছু যায় আসেনা, যে পরমার্থের কাজ করে অর্থাৎ সাধন ভজন পূজন আরাধন সৎসঙ্গ, সে হাত দিয়ে দান না দিলেও কিচ্ছু যায় আসেনা, যার ঘরে একটি সুসন্তান বিদ্যমান, তার লাখ কুসন্তানের প্রয়োজন নেই, আবার যে মাতা পিতার সেবা করে, তার তীর্থযাত্রা ব্রত উপবাসের প্রয়োজন নেই আর যে কপট লোককে বন্ধু করেছে তার বন্ধু থাকা না থাকা সমান।

বড় দূর্লভ এই মানব জীবন,অনেক রাস্তা পার করে এখানে আসতে হয়ছে,তাই এই দূর্লভ মানব জীবনকে সফল করো,কৃষ্ণ নাম বা ভগবানের নাম করে মুক্তির পথ প্রশস্ত করো।

“কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে মানব জনম পেয়েছি যে

দ্বিজদাসের এ ভাবনা, মানব জনম আর হবে না,
তোমায় ভজলে হরি বংশীধারী নিদয় হয়ো না,
তোমায় হৃদমাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেবো না।”

তবে কেবল এর এতটুকু ব্যাখ্যা করা যায় যে, রূপকসাহিত্যে কুল চার প্রকার। যথাঃ
(১) পশুকুল,
(২) মানবকুল,
(৩) দেবকুল
(৪) গুরুকুল বা ঈশ্বরকুল।

মানবজন্মের এই চার লক্ষ জন্মের প্রথম জন্মগুলোতে তার মধ্যে পশুভাব বিরাজিত থাকে। আস্তে আস্তে চেতনার উত্তরণ ঘটতে আরম্ভ করলে আসে মনুষত্ব, তারপরে সাধনা করতে করতে সে দেবত্ব বা শিবত্ব লাভ করে, সেই “পাশবদ্ধ জীব থেকে পাশমুক্ত শিবে” তার উত্তরণ হয়, সেখান থেকে সাধনা করতে করতে ঋষিত্ব বা ঈশ্বরকুল প্রাপ্ত হয় সে। এছাড়াও ঈশ্বরকোটি যে স্তর সেই স্তরেই অবতরণ করেন সদ্গুরু ও অবতারকল্প মহাত্মা যেমন আদি শংকর, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর, রামঠাকুর, গুরু নানক, কবীর, রুইদাস, পরমানন্দজী, পরমানন্দদাস, বল্লোভাচার্য, সুরদাস, মীরাবাঈ, তুলসীদাসজী, অহল্যাবাঈ, রাণী দুর্গাবতী, সীতারামদাস ওঁঙ্কারনাথ, আনন্দময়ী মা ইত্যাদি সদগুরু ও ঈশ্বর সদৃশ মহাপুরুষরা যাঁরা নিত্যসিদ্ধ, যাঁদের কাছে আশ্রয়, পুতঃ সঙ্গকরা ও কৃপাপ্রসাদ জীব উদ্ধারণের ব্রতে অগ্রণী ভূমিকা নেয়।

চুরাশি লক্ষ যোনি ভেদতত্ব (জন্মতত্ত্ব) নিয়ে সুফী সাধক শ্রীচরণদাস বাবাজী লিখেছেন:

শোনো সে চুরাশি লক্ষ যোনি বিবরণ।
মৎস্যে কূর্মে নয়লক্ষ বার জন্ম হয়
ভ্রমিতে পাড়িতে জীব কত কষ্ট পায়।
নয়লক্ষ বার জন্ম হয় ধীরে ধীরে
ঘরবাড়ি ঠিন নাই যথা তথা ফিরে।
ত্রিশলক্ষ বার বৃক্ষ যোনিতে জনম
তাতে যত কষ্ট হয় অশেষ করণ।
ত্রিশলক্ষ বার বৃক্ষ যোনিতে ভ্রমিতে
কত যুগ যুগান্তর যাবে ক্রমেতে।
কৃমিজন্ম দশলক্ষ ভ্রমিয়া বিশেষে
একাদশ লক্ষ বার পক্ষী যোনি শেষে।
বিশলক্ষ বার জন্ম পশুর যোনিতে
নানারূপে কত কষ্ট পায় অবনীতে।
অবশেষে গো যোনিতে জন্ম লয়

এর চেয়ে উত্তম জন্ম পশুকুলে নাই,
গো-যোনির শেষে পশু যোনি নাই।
মনুষ্য যোনিতে জন্ম গো-যোনি ছাড়াই।
মানব কুলেতে জন্ম চারলক্ষ বার
অপরূপ সে বারতা কহি সবিস্তার।
জন্মিয়া মানবকুলে আত্মা না উদ্ধারে
পুনঃ সে চুরাশিলক্ষ যোনিপথে ঘুরে।
বারবার জন্মলাভে কত কষ্ট পায়
শ্রীচরণ দাসে বলে নাইকো উপায়।

শ্রীচরণ দাসের মতে পাপী বা অপরাধীরা নিম্নোক্ত পরিমাণ যোনি খেটে অবশেষে মুক্তিলাভ করে মানব জন্মলাভ করবে।

আবার আরেকটা বিষয় হচ্ছে অন্তর্মুখী হওয়া, কারণ তিনি যে বিরাজ করছেন অন্তরে। তাই কবীরজী বলছেন:

BANGL

মোকো কাঁহা ঢুনঢে বান্দে ম্যায় তো তেরে পাস রে
না ম্যায় মন্দির, না ম্যায় মসজিদ,
ম্যায় তো তেরে বিশ্বাস মে।
আর কবিগুরু বলছেন:
আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাইনি,
বাহির পানে চোখ মেলেছি,
আমার হৃদয় পানে চাইনি।

হৃদয়ে সমাহিত হতে পারলে তখন সামনে আসে দুটো রাস্তা, শ্রেয় আর প্রেয়, কোনটা নেওয়া উচিৎ? সবসময় শ্রেয়কে, সেটাই নিবৃত্তিমার্গ।সেটা নিয়ে আরেকটু বলে পরের পর্বে এলেখার ইতি টানবো।

॥তৃতীয় ও শেষ পর্ব॥

তাহলে চুরাশি লক্ষ যোনির এই যাত্রায় evolution বা বিবর্তন হয়, উন্নতি নয়। এককোষী থেকে বহুকোষী প্রাণ এবং বহুকোষী প্রাণ থেকে জটিলকোষী প্রাণের ধারা বেয়ে চলতে থাকে বিবর্তন। প্রথমে স্বেদজ অবস্থায় আমরা কুড়ি লক্ষ যোনি কাটিয়ে, ভেষজ অবস্থায় আরও কুড়ি লক্ষ যোনি অতিক্রম করে আরও কুড়ি লক্ষ যোনি আমরা অন্ডজ (mammals) হয়ে থাকি এবং শেষ চার লক্ষ যোনি আমরা এপস্ (apes) অর্থাৎ বাঁদর, শিম্পাঞ্জি শ্রেণীর মধ্যে থাকি। এইভাবে চুরাশি লক্ষ যোনির পরে আমরা মনুষ্য শরীর পাই। এই মনুষ্য জন্মতেই বিচার, চেতনা ও অহংকারের মত বৃত্তিগুলো মহামায়া আমাদের প্রদান করেন। কেন করেন? কারণ এই মনুষ্য শরীরের মধ্যেই একমাত্র সেই চরম সত্যকে বোধ করার শক্তি রয়েছে। একটা পিপিলিকা বা হাতির মধ্যেও সেই ব্রহ্ম চেতনা পূর্ণভাবে রয়েছে কিন্তু তার তা বোধ করার কোন ক্ষমতা নেই। মানুষের মধ্যেও ব্রহ্ম চেতনা পূর্ণভাবে রয়েছে এবং সাথে তা বোধ করার ক্ষমতাও রয়েছে। মানুষ এবং বাকি প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য এখানেই।

প্রকৃতির লক্ষ্য এটাই। বিবর্তিত হতে হতে অন্যান্য প্রাণীরা একদিন মানুষে আসবে। কিন্তু মানুষে এসে তারপর কি হবে? মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্ব–মানুষ দেবতা হবে। দেবতার পরে তার কি লক্ষ্য? দেবত্ব থেকে ঋষিত্ব অর্থাৎ দেবতা থেকে ঋষির দিকে যাত্রা শুরু হবে। এবার ঋষির উদ্দেশ্য কি হবে? ঋষিত্ব থেকে ঈশ্বরত্ব-র দিকে যাত্রা শুরু হবে। অর্থাৎ মানুষ হয়ে জন্মালে তার পর থেকে তার উন্নতি হতে থাকবে চৈতন্যে, চেতনা তার ক্রমে উর্দ্ধগামী হবে, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ছেড়ে অহংকার লয়ের স্তরে পৌঁছবে, ক্রমে গুরুকৃপায় অহংকারেরও লয় হবে, তখন সে বড়ো কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যএ দেখা নাই, অর্থাৎ চেতনা গুরুর মধ্যে লয় হয়েছে। এইজন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ আশীর্বাদ করে কল্পতরু হয়ে বলেছেন চৈতন্য হোক। এই চৈতন্য হলে নিজের আসনে বসে নিজের শরীরের মধ্যেই দর্শন হয় নিজের পূর্ব পূর্ব সব জন্মগুলো। এই হচ্ছে যাত্রার ক্রম।

এখানে হানাহানি ও রেষারেষি আসছে বিকার থেকে। একথা ভুললে চলবে না যে আমাদের মধ্যে যখন শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন আমাদের মিথ্যা বলারও শক্তি বাড়ছে, অপরের হানি করারও শক্তি বাড়ছে অর্থাৎ অপরের ভালো করার পাশাপাশি ক্ষতি করারও শক্তি বাড়ছে। যেমন দুর্যোধনের শক্তি সাংঘাতিক, জ্ঞানের ভান্ডারেও তিনি যথেষ্ট সমৃদ্ধ, শাস্ত্রবিদ্যাতেও তিনি পারদর্শী, গদাযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধে তিনি ভীমের থেকেও উন্নত। ঠিক তেমনই তাঁর অহংকার এবং ঈর্ষাও সাংঘাতিক। একটা কুকুর বা বেড়ালের মধ্যে ঐরকম অহংকার বা ঈর্ষা আপনি দেখবেন না। সুতরাং কোন মানুষ যখন খুব অন্যায় কাজ করে তখন তাকে পাশবিক বলা খুবই ভূল হবে, তাতে পশুকে অপমান করা হয়। আগেই বলেছি একটা পশু মানুষের মত অত সাংঘাতিক অন্যায় করতে পারবে না, তার পক্ষে চূড়ান্ত নৃশংস হওয়া অসম্ভব। তাই মানুষের এহেন আচরণকে পাশবিক না বলে বলা উচিৎ নরাধম।

অন্যদিকে একজন পাশবিক প্রবৃত্তির মানুষের লক্ষণ হবে সে খুব বোকাহাঁদা, দুম করে রেগে গিয়ে কাউকে মেরে দেবে, তাকে বোঝালে অত বুঝবে না, তাকে চড় মারলে সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে যাবে। তার বয়স যখন ষোলো-আঠারো বছর হবে দেখবেন তার মধ্যে যৌনতার সাংঘাতিক প্রাবল্য এবং তার মধ্যে অনেক কুঅভ্যাস ও কুমুদ্রা রয়েছে। এর মানে যে সে খুব খারাপ ছেলে বা মেয়ে তা নয়, যেহেতু তার প্রথম মানুষ জন্ম হয়েছে তাই তার মধ্যে পাশবিক বৃত্তিগুলো খুবই প্রবল। পাশবিক বৃত্তি মানে শারীরিক বৃত্তি, তামসিক বৃত্তি। কিন্তু হিটলার পাশবিক নয়, তাকে দৈত্য বা দানব বলা যেতে পারে।

মানুষের মধ্যে অসীম শক্তির প্রকাশ সম্ভব কারণ ঈশ্বর তাকে সেই সুযোগ দিয়ে রেখেছেন। তাই মানুষের হাতে choice আছে যে সে চরম ভালোর দিকে যাবে নাকি মন্দের দিকে যাবে, সেই যে শ্রেয় না প্রেয় কোন রাস্তাটা নেব। কারণ শক্তি নিউট্রাল। এই যে অনেক ভক্ত মায়ের পূজা করেন, যেমন রামপ্রসাদের মত একজন ভক্ত এই মা-কে করুণাময়ী, স্নেহময়ী ও প্রসন্নময়ীরূপে দেখেন। ভক্ত যেভাবে মাকে দেখতে চায় মা তার কাছে তেমন। কিন্তু মায়ের প্রকৃত রূপ কেমন?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন সেকথাই বললেন যে মা তোর তো অনেক রূপ দেখেছি, তোর আসল রূপ দেখব। মা তখন এক অপরূপা সুন্দরী কিশোরী হয়ে তাঁর সামনে এলেন, আস্তে আস্তে বড় হলেন, গর্ভবতী হলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, পরম যত্নে মা নবজাতককে বুকের দুধ খাওয়াতে আরম্ভ করলেন এবং তারপর তাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগলেন। মায়ের মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে আরম্ভ করল। ঠাকুর বললেন বুঝেছি মা, আর দেখাতে হবে না। অর্থাৎ শক্তি করুণাময়ীও নয়, নিষ্ঠুরময়ীও নয়, শক্তি কল্যাণেরও নয়, অকল্যাণেরও নয়, শক্তি ভালোরও নয় আবার মন্দেরও নয়। শক্তি neutral বা নিরপেক্ষ।

কারুর মধ্যে শক্তি জাগলে তাকে সে ভালো কাজে ব্যবহার করবে নাকি মন্দ কাজে করবে তা নির্ভর করছে তার স্বভাব ও প্রকৃতির উপর। কারুর মধ্যে শক্তি জাগলে সে রাবন হবে না রাম হবে তা তার choice. কারণ রাবনের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি ছিল, তিনি শিবের তপস্যা করে বর পেয়েছিলেন। অর্থাৎ শক্তি পাত্র দেখে না, শক্তি বলবে না যে তুই খারাপ লোক, তোর মধ্যে জাগব না। শক্তি দেখে আধার। ধারণ করার যোগ্যতা তৈরি হলে শক্তি automatically তার মধ্যে জাগবে।

এবার সেই শক্তি দিয়ে সে নিজের বিবেক ও স্বভাব অনুযায়ী সৃষ্টিশীল কাজ, স্থিতির কাজ বা বিনাশের কাজ করে থাকে। আর এই বিবেকের জাগরণ হয় সৎ সঙ্গে।

জগতের হানাহানি, রেশারেশি নিয়ে এত দুঃখ কেন? শিক্ষা, সঙ্গ তথা আধ্যাত্মিক পরিবেশ কোথায়? আগে তেমন পরিবেশ তৈরি হোক, স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এক আধ্যাত্মিক বাতাবরণ সৃষ্টি হোক এবং সমাজের বিভিন্ন জায়গায় সৎ, নির্লোভ ও ত্যাগী মানুষের সংখ্যা বাড়ুক। দম্পতিরা বিবাহ করার পর মহাত্মা জন্ম দেবার প্রার্থনা করে প্রস্তুতি নিক। এমন সন্তানের জন্য প্রার্থনা করুক তারা যে ছেলে বা মেয়ে

শুধু নিজের মা, বাবা ও পরিবার প্রতিপালন করার জন্য আসবে না, দামী গাড়ি, বাড়ি নিয়ে বিলাসিতা করার জন্য জন্মাবে না, যে আসবে সমগ্র জগতের জন্য।

কি করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হোল? কি করে বিবেকানন্দকে পেল সমাজ? ভুবনেশ্বরী দেবী তো চাননি তাঁর ছেলে খুব জাগতিক এক ইঞ্জিনিয়ার বা ব্যারিস্টার হোক, এমন ছেলে যে সবসময় তাঁকে দেখবে, সারাজীবন 'মা মা' করবে, একদমই মায়ের কথার অবাধ্য হবে না, যে বিকালবেলায় খেলতে না গিয়ে টিউটরের কাছে পড়তে যাবে, যে নিজের বাঁকা শিরদাঁড়া নিয়ে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে তার পরিবার ও সমাজের কাছে। ভূবনেশ্বরী দেবী প্রার্থনা করেছিলেন একজন শিবের মত সন্তান। তিনি খুব ভাল করেই জানতেন তাঁর প্রার্থনার সন্তান সংসারী হবে না। আজকে সেই ভূবনেশ্বরী দেবীকে সবাই বিবেকানন্দের জন্যই চেনে। বিদ্যাসাগরের মা চেয়েছিলেন ছেলের কাছে গ্রামের উন্নতি কল্পে ইস্কুল। তবেই না বিদ্যাসাগরকে পেয়েছি আমরা।

রোজ পিলপিল করে লক্ষ লক্ষ যেসব ছেলেমেয়ে জন্মাচ্ছে তারা সমাজে কোন দাগ রেখে যেতে পারছে না। অন্যদিকে একা বিবেকানন্দ একটা পৃথিবী কাঁপিয়ে দিতে পারেন। এই উন্নত সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য বাবাদের ভূমিকাও তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, প্রয়োজন শুধু উন্নত মা। এগুলো সব গর্ভ উপনিষদের বিজ্ঞান যেগুলো আজ হারিয়ে গেছে। যেমন রাবণের বাবা ঋষি বিশ্বশ্রবা হলেও রাবণের মত সন্তানের জন্ম হল কারণ মা কৈকেশী উন্নত নয়। হিরণ্যকশিপুরের ছেলে প্রহ্লাদকে উদ্দেশ্য করে বলা হত "দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ"। হিরণ্যকশিপুরের মত ওরকম একজন rationalist যে বিষ্ণুর নামই শুনতে চায় না তার ছেলে কিকরে প্রহ্লাদ হল? কারণ প্রহ্লাদের মা কয়াধূ ছিলেন একজন মহিয়সী নারী।সুতরাং আধার তৈরী করতে হবে মাকেই, এইজন্যই বিবেকানন্দ বলেছেন, বিদ্যাসাগর বলেছেন নারীশিক্ষার কথা, আধুনিক হোক নারী মননে, চেতনে, স্বনির্ভর হোক কিন্তু নাক উঁচু, অহং সর্বস্ব যেন না হয়, এমন নারী হোক যে কঠোরে কোমলে হাল ধরে সন্তানকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করবে। সার্থক মানব জমিন তৈরী হবে যার তত্ত্বাবধানে।তাই রামপ্রসাদ বলছেন:

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা।।
কালীনামে দেওরে বেড়া,
ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য অব্দশতান্তে বা,
ফসল বাজাপ্ত হবে জান না।
আছে একতারে মন এইবেলা,
তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥

গুরুদত্ত বীজ রোপণ ক'রে,
ভক্তিবারি তায় সেচ না।
ওরে একা যদি না পারিস মন,
রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না॥

সুতরাং বাবার ভূমিকা শুধুমাত্র বীজ প্রদান করা। কিন্তু এক্ষেত্রে বীজের থেকে যিনি তাকে পালন করছেন সেই জমি কেমন তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জমি ভাল হলে খারাপ বীজেও ফসলের গুণগত মান ভাল হয়ে যাবে। এ বিজ্ঞান খুবই সূক্ষ্ম। পুরুষ কি দেয়? শক্তি দেয়। আর মা সেই শক্তিকে স্বভাব দেয়। সুতরাং সেই প্রদান করা শক্তি থেকে দেবতা জন্মাবে নাকি দানব তা ঠিক করেন মা।

যে অবধি পর্যন্ত আত্মার মুক্তি লাভ হবে না,ততদিন পর্যন্ত মানুষকে এই চুরাশির ফেরে ঘুরতেই হবে, যে কোনোরূপে।তাই কর্মগুণে সদ্গুরু আশ্রয় প্রাপ্ত হলে, তিনি সঠিক রাস্তায় চালিত করে মুক্তির রাস্তা দেখিয়ে দেন। সাধক রামপ্রসাদ বলছেন:

BANGL

ওরে সুরাপান করিনে আমি,
সুধা খাই জয়কালী বলে;
মন-মাতালে মাতাল করে,
মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মশলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান-শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটি,
পান করে মোর মন-মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা মা;
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে॥

এবারে আসি সাধনা প্রসঙ্গে, সাধনা অর্থাৎ সাধতে হয় যা, অভ্যাসযোগ, সেটার মধ্যেই আছে সংযম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন-পতঞ্জলি ঋষির বলা অষ্টাঙ্গ যোগ। কিন্তু এসব করে কী হবে?চেতনার অগ্রগতি হয়ে ষটচক্র ভেদ করে আজ্ঞাচক্রে স্থিত হয়ে আত্মদর্শন প্রথম উদ্দেশ্য।

প্রথম পাঁচটা চক্র প্রতিটা চক্র এক একটা তত্ত্ব যে, মূলাধার-পৃথ্বীতত্ত্ব, স্বাধীষ্ঠান- জল বা অপতত্ত্ব, মণিপুর - অগ্নি বা তেজতত্ত্ব, অনাহত-মরুৎ বা বায়ু আর বিশুদ্ধ-আকাশতত্ত্ব (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম-যে পঞ্চভূত দিয়ে তৈরী শরীর)। আবার পাঁচটা আঙ্গুলে আছে পঞ্চতত্ত্ব যেমন অঙ্গুষ্ঠা বা বুড়ো আঙ্গুল হোল অগ্নিতত্ত্ব, তর্জনী হোল বায়ুতত্ত্ব, মধ্যমা হোল আকাশতত্ত্ব, অনামিকা হোল পৃথ্বীতত্ত্ব আর কনিষ্ঠা হোল জলতত্ত্ব। তিনটে নাড়ি শরীরে-ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না-গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী। সদ্গুরু শক্তিপাত অথবা বীজদান করবার সময় মূলাধারের যে আড়াই প্যাঁচে ঘুমন্ত কুন্ডলিনী শক্তি তাকে জাগ্রত করে দেন, চেতনার উন্মেষ হোল। তারপর সাধনা করতে করতে একে একে গুরুকৃপায় ভেদ হয় আরো চারটে চক্র, চেতনা উঠতে থাকে ওপরের

দিকে এবং ষষ্ঠ চক্র আজ্ঞাচক্রে গিয়ে স্থিত হলে চেতনা-হয় আত্মদর্শন, নিজেকে নিজে জানা। কবিগুরুর কথায়:

আপনাকে জানা আমার ফুরাবে না,
সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।

কিন্তু সাধনা হয় গোপনে, সেই ঠাকুরের কথায়, "মনে, বনে আর কোণে।" সাধনা আসলে যেহেতু অন্তর্মুখী ব্যাপার, তাই গোপী হতে হবে, অর্থাৎ গুপ্তভাবে সাধনা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলছেন মাতা পার্বতী বাউল তার গানে:

কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে,
শ্যামের পিরিত রাখ গোপনে।
ইশারায় কইবি কথা গোঠে-মাঠে
দেখিস যেন কেউ না জানে॥
কেউ না বোঝে কেউ না শোনে
শ্যামকে যখন পড়বে মনে,
চাইবি কালো মেঘের পানে।
আর রান্নাশালে কাঁদবি বসে
ভিজে কাঠ দিয়ে উনুনে॥
বলি শ্যাম শায়রে নাইতে যাবি
গায়ের বসন ভিজবে কেনে,
শায়রে সাঁতার দিয়ে আসবি ফিরে
বলি গায়ের বসন ভিজবে কেনে,
উত্তর যাবি সতর হবি
বলবি আমি যাই দক্ষিনে।
আরে মনের কথা মনে থাকে
অ-রসিকে জানবে কেনে॥

BANGL

কিন্তু তবু সংশয় থাকে মনে ঠিক রাস্তায় এগোচ্ছি তো? হবে তো প্রাপ্তি সেই পরম পদ যে ধ্রুবপদ দিয়েছেন বেঁধে তিনি বিশ্ব তানে? তাঁর দর্শন হবে তো? মনের এই সন্দেহের দোলাচলে মেঘ আসে হৃদয় আকাশে যাতে তাঁকে দেখতে দেয় না। কী করবো তখন?

সংশয়তিমিরমাঝে না হেরি গতি হে।
প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগপতি হে॥
বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে,
সতত বিরাজো হৃদয়পুরে-
তোমা বিনে অনাথ আমি অতি হে॥

মিছে আশা লয়ে সতত ভ্রান্ত,
তাই প্রতিদিন হতেছি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে-
নিবারো নিবারো প্রাণের ক্রন্দন,
কাটো হে কাটো হে এ মায়াবন্ধন
রাখো রাখো চরণে এ মিনতি হে॥

তাঁর দুয়ারে তাঁরই কাছে হাত পেতে আকুল হয়ে ডাকতে হবে যাতে তিনি দূরে না রেখে কাছে টেনে নেন।তাঁকে পাবার সাধন মার্গ তিনিই দেখিয়ে দেন।

এখানে আবার কথা আছে একটা। সেটা হোল সাধনায় জীবের চৈতন্য উর্দ্ধে ওঠে আর কৃপায় ভগবান নিচে নামেন আবার ভক্ত ছাড়া ভগবান আসেন না। সেই যে রবিঠাকুরের গান:

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে॥
তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তব আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ-বেশে
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।
তাই তো, প্রভু, হেথায় এল নেমে,
তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে,
মূর্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

BANGL

অর্থাৎ ভক্ত ভগবানের যুগল সম্মিলনেই চলে জীবনের খেলা, যেমন পরমভক্ত রাধা ছাড়া কৃষ্ণ নেই, সারদা মা -বিবেকানন্দ ছাড়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ নেই, বামাখ্যাপা ছাড়া তারা মা নেই, সীতা-লক্ষ্মণ-হনুমানজী ছাড়া শ্রীরামচন্দ্র নেই। কারণ ভগবানের মহিমা প্রচার করবে কে? করবে ভক্ত। তাই "মূর্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।" আর মহিমা প্রচার হবে কিভাবে? সেও বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ:

তোমারি নাম বলব নানা ছলে,
বলব একা বসে আপন মনের ছায়াতলে॥
বলব বিনা ভাষায়, বলব বিনা আশায়,

বলব মুখের হাসি দিয়ে, বলব চোখের জলে॥
বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পূরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে॥

কারণ আমরা সবাই যে সেই পরমাত্মার সন্তান, তাই তাঁর মহিমাই যে গাইব তাঁর নাম বলে। গাইতে গাইতে, ডাকতে ডাকতে তিনি নিচে নামতে থাকবেন, আর সাধনা করতে করতে আমাদের চেতনা ওপরে উঠতে থাকবে, একসময় তাঁর পরশরতন আসবে কোনো পথ ধরে, তাঁর সাযুজ্য পাবো, তাঁর সভামাঝে বসার যোগ্যতা অর্জন করবো তাঁরই করুণায়। একদিন দেখা দিয়ে কৃপা করে তুলে নেবেন তাঁর সান্নিধ্যে, সেদিনের অপেক্ষায় সারাজীবনের সাধনা, জন্ম-জন্মান্তরের শরণাগতি আর ফোকাস ঠিক রাখা যে তাঁকে পেতেই হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথায় একমাত্র তিনিই নিত্য, সত্য বস্তু, অপরিবর্তনীয় বাকী সব অ-বস্তু, অনিত্য, পরিবর্তনশীল। তাই ফুলের মালা, ধুপের ধোঁয়া, ঘন্টা ধ্বনি এসবের আড়ম্বরে তিনি যেন ঢাকা না পড়ে যান সেটা খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ আচার, নিয়মের নিগড়ে পড়ে তাঁকেই না বিস্মৃত হই সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে আর বলবো কবিগুরুর ভাষায়:

BANGL

আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক-না হারা॥
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ, ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে আমার দুটি আঁখিতারা ॥
হারিয়ে-যাওয়া মনটি আমার
ফিরিয়ে তুমি আনলে আবার॥
ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি,
গলার হারে দোলাও তারে গাঁথা তোমার ক'রে সারা॥

॥ঝুলনযাত্রা তত্ত্ব॥

জয় রাধে জয় রাধে জয় জয় বৃষভানুকুমারী,
জয় রাধারমণ গোপীমনমোহন কানহা রাইকিশোরী।
জয় বৃন্দাবন শ্যামলকুঞ্জে শ্যাম মনোহর প্যারী,
জয় জয় গোপীনাথ জয় জয় ব্রজরাজ কিশোরী।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ যাত্রার কথা উল্লেখ আছে শাস্ত্রে। প্রতি মাসে একটি করে পূর্ণিমা তিথিতে বৈষ্ণবরা সেই যাত্রাগুলি পালন করেন। ঝুলন পূর্ণিমা বা ঝুলন যাত্রা তাদের মধ্যে অন্যতম।

শাস্ত্রে বলে-

“অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥”

BANGLADARSHAN.COM

ভগবান ভক্ত অভক্ত নির্বিশেষে সকলকে অনুগ্রহ করবার জন্য গোলকধাম থেকে ভূলোকে এসে লীলা করেন। এই লীলার কারন সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলে-ভগবানের এই দিব্যলীলার আনন্দ মাধুরী শ্রবন করে ভক্তগণ দিব্য ও অমৃত ভক্তি লাভ করবে। বিষয়ভোগে মত্ত মানবের মনে শ্রীভগবানের অপার লীলা শ্রবনের পর শুদ্ধ ভক্তি জন্মাবে এবং সে ভগবানের শ্রীচরণে মনোনিবেশ করবে। ভগবান গোবিন্দের নিত্য অষ্টকালীন লীলাগুলি হোলোনিশান্ত-প্রাত, পূর্বাহ্ণ , মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন, প্রদোষ ও নক্ত। এই লীলাগুলির মধ্যে একটি দিব্যলীলা হোলো “ঝুলন যাত্রা।” ঝুলন শব্দের সাথে “দোলনা” শব্দটিই ফুটে ওঠে। ভগবান মধুসূদনের এই দিব্যলীলার কথা স্মরণ করে ভক্তেরা তাই শ্রীরাধামাধব সুন্দরকে দোলনাতে বসিয়ে পূজো করেন। ভক্তের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় শ্রীভগবানের ঝুলন লীলার অপূর্ব সঙ্গীত।

গগনে কৃষ্ণ মেঘ দোলে-
কিশোর কৃষ্ণ দোলে বৃন্দাবনে।
থির সৌদামিনী রাধিকা দোলে নবীন ঘনশ্যাম সনে॥
দোলে রাধা শ্যাম ঝুলনদোলায়-
দোলে আজি শাওনে॥
পরি’ ধানি রঙ ঘাঘরি, মেঘ রঙ ওড়না
গাহে গান, দেয় দোল গোপীকা চলচরণা-,
ময়ূর নাচে পেখম খুলি’ বনভবনে।।-

গুরু গম্ভীর মেঘমৃদঙ্গ বাজে আঁধার অশ্রুর তলে-,
হেরিছে র্রজের রসলীলা অরুন লুকায়ে মেঘকোলে।-
মুঠি মুঠি বৃষ্টির ফুল ছুঁড়ে হাসে
দেবকুমারীরা হেরে অদূর আকাশে-,
জড়াজড়ি করি' নাচে, তরুলতা উতলা পবনে॥

'রাধাতন্ত্রে' বলা হয়েছে, সতীর কেশ পড়েছিল যে স্থানে, সেই পীঠস্থানেই গড়ে উঠেছিল বৃন্দাবন। বৃন্দাবন ঘিরে বারোটি বন–ভদ্র বন, শ্রীবন, লৌহ বন, ভান্ডীর বন, মহাবন, তালবন, খদির বন, বহুবন, কুমুদবন, কাম্যবন, মধুবন ও বৃন্দাবন। এছাড়া কিছু উপবন আছে। তার মধ্যে নন্দন ও আনন্দ বনে কৃষ্ণ শয়ন করেন। পলাশ, অশোক ও কেতকি বনে কৃষ্ণ গন্ধসুখ উপভোগ করেন, কৌলবনে অমৃত আস্বাদন করেন। সঙ্কেত, দ্বিপদ, চতুর্থ বন প্রভৃতি বনে কৃষ্ণ রাসলীলা করেন, আমোদ করেন। অন্যান্য বনে গো চারণ করেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্য চরিতামৃত'-এ লিখলেন–

'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥'

BANGLADARSHAN.COM

ভাগবত মতে, পদ্মিনী লক্ষ্মী দুই আধারে জন্ম নিয়েছিলেন। এক স্বয়ং রাধা আর অন্য রূপটি হল রাধার প্রিয় সখী চন্দ্রাবলী। কোথাও এরা আবার অভিন্ন, একজনেরই দুই নাম। এঁদের মধ্যে সুপ্ত প্রতিযোগিতা ছিল কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য। তবে, রাধার মতো ভক্তপ্রেমিকা আর কেউ ছিলেন না, কৃষ্ণই ছিলেন তাঁর ধ্যান, কৃষ্ণই ছিলেন তাঁর জ্ঞান। তবু কৃষ্ণের হ্লাদিনী হয়ে ওঠায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অহং, আমি। সেই জন্যই তো চন্দ্রাবলীর সঙ্গে তাঁর প্রতিযোগিতা, 'আমি'র বেড়া না থাকলে প্রতিযোগিতা হয় না। সেই বেড়া ভাঙতেই কৃষ্ণ আয়োজন করেছিলেন ঝুলন লীলার।

শ্রাবণমাসের পূর্ণিমা তিথির ঘোর বর্ষায় যখন প্রাকৃত প্রাণীরা কামলীলায় মত্ত; তখন আয়োজন শুরু হল রাধাকৃষ্ণের ঝুলন লীলার। সঙ্কেত বনের ধারে যমুনার তীরে যে কদম গাছটি ফুলে ফুলে ভরে উঠেছিল তার ডালে দোলনা বাঁধা হল, দোলনা সাজানো হল নানা রঙের ফুল দিয়ে, এমনকি কৃষ্ণ মালায়-গোপিনীরাও ফুলে-সেজে উঠলেন। ফুলমালায় সেজে সেখানে রাধারও আসার কথা। কিন্তু অনেক বাধা কাটিয়ে ভিজে ভিজে আসতে রাধার খানিক দেরি হল।

নিঙ্গাড়িয়া নীল শাড়ি শ্রীমতি চলে
শ্যামলের বেণু বাজে কদম তলে।
সে সুরের মায়াজালে রাধা বিবশা
চকিতা হরিণী সম থামে সহসা

যেন বিনিসুতার মালা কে পরালো গলে।

পথে তিনি ভাবতে ভাবতে আসছিলেন যে, কৃষ্ণ হয়তো তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু এসে দেখলেন কোথায় কী তাই দেখে বড় অভিমান হল !কৃষ্ণ এরই মধ্যে গোপিনীদের সঙ্গে মেতে উঠেছেন ঝুলন খেলায় ! তাদের প্রেম কি !তাঁর। আমার চেয়ে তারা বড় হলআমার চেয়েও বড়? আমাকে উপেক্ষা করলেন কৃষ্ণ? বেরিয়ে এলো 'আমি'র অহং। বুকফাটা অভিমান কান্না হয়ে নেমে এলো চোখ বেয়ে। ঠিক তখনই কৃষ্ণ তাঁর কাছে এলেন, বোঝালেন,

"ভক্তি আর প্রেম দিয়ে যে আমারে চায়,
সেই আমারে পায়।"

চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি প্রেমের ঠাকুর প্রেমের টানে আসেন ভক্তের কাছে, আকুল প্রাণে তাঁকে ডাকলে তিনি না এসে থাকতে পারেন না। রাধার এই যে অভিমান, এর কারণ আসলে 'আমির আবরণ।' অন্তরে কৃষ্ণকে বসিয়েও রাধা তাই তাঁকে যেন পুরোপুরি পেয়েও পাচ্ছেন না। এই যে দেহটা এর মধ্যেই কি শুধু রাধা আছেন? তা তো না। তিনি তো সমস্ত চরাচরে, সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে রয়েছেন, এমনকি এই যে গোপিনীরা, এঁদের মধ্যেও রয়েছেন।

BANGLADARSHAN.COM

রাধা বিরহের বেলায় কালো মেঘের মধ্যে যেমন শ্যামকে দেখেন, তেমনি কৃষ্ণও পুরুষ হয়ে সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে রাধাকে খোঁজেন। তখন রাধা তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। এসে বসলেন দোলনায়, প্রিয় কৃষ্ণের পাশে। গোপিনীরা দোলনায় দোল দিতে লাগলেন পরম আনন্দে। 'আমি'র অহং চূর্ণ হয়ে মিলন হল বাইরের রাধার সঙ্গে অন্তরের কৃষ্ণের। পূর্ণরূপে ইষ্টকে পাবার তখন আর কোন বাধা রইল না। এই পথে অহং এর আবরণ-প্রকৃতি হয়ে চৈতন্যদেব ও রামকৃষ্ণদেব রাধাভা-খুলে নিরাবরণবে ইষ্টের সাধনা করেছেন, ইষ্টকে পেয়েওছেন। আসলে, এই পথ দেখানোতেই ঝুলন লীলার সার্থকতা। পথ পেলেই সাধনা তার লক্ষ্য খুঁজে পায়, লক্ষ্যে পৌঁছনোর ইশারায় তখন তার শুরু অনন্তকে ছোঁয়ার আশায় আরতিমুখর ব্রজন...

এই পাঁচদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দোলনার উপর উপবেশন করেন তাঁর আহ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকার সঙ্গে। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরসের আধার হল রাধাভাব। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরা প্রকৃতি বা পুরুষোত্তম আর-অপরা প্রকৃতি ভক্ত স্বরূপিনী। প্রতিটি ভক্তই সেই রাধা ভাবে ঈশ্বরের সহচর্য লাভে ব্যাকুল।-রাধারাণী হচ্ছেন শাস্ত্র মতে এই ঝুলন যাত্রার সঙ্গে জড়িত আছে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের তত্ত্ব।মূলতঃ শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পালিত হয় ঝুলন। আমরা বাঙ্গালীরা ঝুলনের গান বলতে বুঝি শ্রদ্ধেয়া শিল্পী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীত এই গানটা:

কুসুম দোলায় দোলে শ্যামরাঈ
তমালশাখে ঝোলা ঝোলে ঝুলনে,

শ্যামের পাশে শ্রীমতি হাসে
যুগল শশী যেন বৃন্দাবনে।
দোলে কৃষ্ণমেঘে ঐ সৌদামিনী
হিল্লোল দেয় দোল ব্রজগোপিনী
বাজায় নুপুর নাচে ময়ূরী ময়ূর
যমুনা উজান বয় ভরা শ্রাবণে।
দোলে কুঞ্জবনে দুহুঁ রঙ্গে বিভোর
মন জানে কেবা শ্যাম, কেবা চকোর,
ঐ রূপ মাধুরী, আঁখি করেছে চুরি
শ্রীমতি শ্যাম দোলে আমার মনে।

ঝুলন বলতে একটা ফুলের দোলনায় দোলন রত রাধাকৃষ্ণের ছবি যেন ভেসে ওঠে চোখের সামনে। অনেকেই আমরা ঝুলন সাজাই বাড়িতে।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ফলে সূর্যের কিরণ পৃথিবীর এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধের দিকে সরে যায়। এটি পৃথিবীর বার্ষিক গতি। আর প্রকৃতির নিয়ম মেনে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয় প্রতিদিন যা পৃথিবীর আহ্নিক গতি। প্রকৃতির এই নিয়ম চিরাচরিত, এই নিয়মের পরিবর্তন নেই। তেমন ঈশ্বর ও ভক্তের বিশুদ্ধ প্রেমভক্তিরসের কোন পরিবর্তন নেই। এই অমোঘ নিয়মের মতোই তা শাশ্বত। তাই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্-ণ ও তাঁর প্রেমভক্তিস্বরূপা রাধিকার ঝুলন দোলনাটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে দোলানো হয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে আহ্নিক গতির কারণে দিন ও রাতের মতোই ঈশ্বর ও জীবের অস্তিত্বকে সত্য বলে ব্যাখ্যা করা হয়। ঠিক একই ভাবে দোলযাত্রার দোলনাটি থাকে সূর্যের বার্ষিক গতির নিয়মকে মেনে উত্তর থেকে দক্ষিণে। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ বোঝাতেই এই নিয়ম।এই রহস্যময় দোলনা আসলে পৃথিবীর দুই দোলনকাল। Oscillatory motion এর মাধ্যমে revolution, rotation এগুলোকে বোঝাতে এই উৎসব। খুবই বিস্ময় লাগে ভাবলে যে আমাদের প্রাচীন মুনি ঋষিরা এগুলো নিজেদের পর্যবেক্ষণ ও সাধনা দিয়ে নিরুপণ করেছিলেন ঘরে বসে, কোথাও গিয়ে সেটা রেজিস্টার করিয়ে নোবেল বা অন্য প্রাইজ না পেয়েও আজকে তাঁরা স্মরণীয়, বরণীয়। মানুষ যা যা নিয়ে নিজের ভোগ চরিতার্থ করে, যেমন গান, নাটক, কাব্য, নৃত্য সবটাই কিন্তু সেই সব সাধকদের ত্যাগের মাধ্যমে সভ্যতার প্রাপ্তি।

রবিঠাকুরের সোনারতরী কাব্যগ্রন্থের “ঝুলন” কবিতার প্রথম ও শেষ লাইনদুটি আজও ঝুলনের দিনে কত প্রাসঙ্গিক-

BANGLADARSHAN.COM

আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে, মরণখেলা, নিশীথবেলা।
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে, ঝুলনখেলা, নিশীথবেলা।

একটু অন্যরকম প্রসঙ্গ তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায় বলি :

সাধুর হৃদয়ে ঝুরে নামের মহিমা,
নামের মাহাত্ম্য বর্ণণ নাহি তার সীমা।
একবারে হরিনামে যত পাপ হরে,
জীবের সাধ্য নাই ততো পাপ করে।
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব,
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ।
মালী হইয়া করে সেই বীজ আরোপন,
শ্রবণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন।
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পর ব্যোম পায়।
তবে যায় তদুপরি গোলোকবৃন্দাবন,
কৃষ্ণ চরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহন।
হরিনাম করিলে না রহে যমভয়
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাক না রহে সংশয়।

BANGLADARSHAN.COM

ভক্তসাধক কবি গদাধর ভট্ট তাঁর পদে এঁকেছেন ঝুলনকে এভাবে :

ঝুলত নাগরি নাগর লাল,
মন্দমন্দ সব সখী ঝুলাবতী-, গাবতি গীত রসাল।
ফরহরাতি পটপীত নীল কে, অঞ্চল চঞ্চল চাল
মনহু পরস্পর উমাঙ্গি ধ্যানছবি-, প্রগট ভই তিহি কাল।
মল্লিমাল প্রিয় কী উরঝি পিয়া তুলসী তলমাল
জানু সুরসরি রবিতনয়া মিলিকে শোভিত শ্রেণী মরাল।
শ্যামল গৌর পরস্পর প্রতিছবি, শোভা বিশদ বিশাল,
নিরখি গদাধর রসিক কুবরিমন-, পায়ো সুরস জঞ্জাল।

কিশোর কৃষ্ণ আর রাধারানীর যে মাধুর্যপূর্ণ প্রেমের পরিপূর্ণ প্রকাশ বৃন্দাবনে স্থাপিত হয়েছিল তারই লীলাস্বরূপ এই ঝুলনযাত্রা পালিত হয়ে থাকে। রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে বিশু-দ্ধ প্রেমের আদানপ্রদানের

মাধ্যমে এই জীবজগতে প্রথম প্রেমের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন আর সেই লীলার নানারূপ এই ঝুলন যাত্রায়-কৃষ্ণের মূর্তি দোলনায় স্থাপন করে পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে ঝোলানো-ভক্তকুলের সামনে পরিবেশিত হয়। রাধা হয়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির রূপক আর রাধা হলেনতাঁর পরম ভক্তস্বরূপিনী।গোপিনীরা দোল দিচ্ছেন। নিত্যচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের সাথে পরমাপ্রকৃতি যোগমায়া শ্রীরাধিকাকে দোলা দিচ্ছেন মহামায়ার অংশ স্বরূপা গোপিনীরা, দোলনা দুলছে কিন্তু নিত্যচৈতন্য আর যোগমায়া দোলনায় দুললেও তাঁরা পরমনিত্য, গোলোকের চির অক্ষয় যুগল মুরতি। গোপিনীদের যে সাধনা তা গুপ্ত, লোকচক্ষুর আড়ালে যেখানে দেহবোধ, লোকলজ্জা, সমাজ সংসার ছেড়েছেন তাঁরা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অষ্টপ্রহরের আটটি লীলার কথা বলা আছে পুরাণে যার মধ্যে একটি দিব্যলীলা হল এই ঝুলনযাত্রা। শ্রীকৃষ্ণ রাধার অষ্টসখীর সঙ্গে একত্রে বৃন্দাবন কুঞ্জে নৃত্য গীত সহযোগে রাধার সঙ্গে দোলনায়-ঝুলেছিলেন। এই অষ্টসখীর নাম পুরাণে পাওয়া যায়-ইন্দুরেখা, চিত্রা, চম্পকলতা, ললিতা, বিশাখা, তুঙ্গবিদ্যা, সুদেবী এবং রঙ্গদেবী। এই দিনে কদম গাছে দোলনা বেঁধে সখীরা রাধা কৃষ্ণের ঝুলন পালন-করেছিলেনবলেই বিশ্বাস করেন বৈষ্ণবেরা।

ঝুলননলীলাকে অনেকে হিন্দোলননলীলাও বলে থাকেন। সাধারণত হিন্দোল রাগ গাওয়া হয়ে থাকে হিন্দোলননলীলা যা মূলতঃ বসন্তের সঙ্গে জড়িত। তবে শ্রাবণের ঝুলনেরও কিছু কিছু হিন্দোল রাগাশ্রীত গান আছে। শাস্ত্রমতে রাধা হলেন কৃষ্ণেরই অংশ, কৃষ্ণের শরীরের বামভাগ থেকে তাঁর জন্ম। তিনি কৃষ্ণের পরম ভক্তস্বরূপিণী, কৃষ্ণপ্রেমে তিনি পাগল, কৃষ্ণের পরম আরাধ্যা দেবী তিনিই। তাই কৃষ্ণকে পেতে গেলে রাধার উপাসনাও অবশ্যকর্তব্য। রাধার কৃপা থাকলে অতি সহজেই কৃষ্ণকে লাভ করা যায়। আবার রাধার শক্তিতে কৃষ্ণ বলবান, তাই এরা এক ও অভিন্ন। বৈষ্ণব তত্ত্বে একে বলে অদ্বৈতভেদাভেদ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমময় মূর্তিকে দোলনায় স্থাপন করে মূর্তিযুগলকে ঝোলানো, পাঁচদিন ধরে তাঁদের নানারকম সাজে সাজানো, প্রেমভক্তি, নামগান, বৃন্দাবনে তাঁদের বিশুদ্ধ প্রেমপর্ব সমস্তকিছু ভক্তগণের সামনে ঝুলনযাত্রার মাধ্যমে পরিবেশ-ন করা হয়। আরেকজন পুষ্টি মার্গের অষ্টছাপ ভক্তকবি সুরদাসজীর পদের ভজনে ফুটে উঠেছে ঝুলনের রূপটা সুন্দর করে :

ঝুলত শ্যাম শ্যামা সঙ্গ
নিরখি দম্পতি অঙ্গ শোভা
লজত কোটি অনঙ্গ।
মন্দ ত্রিবিধ সমীর শীতল,
অঙ্গ অঙ্গ সুগন্ধ,
মচত উড়ত সুবাস সঙ্গ
মন রহে মধুকর বন্ধ।

BANGLADARSHAN.COM

তৈসিয়ে যমুনা সুভগ জহ
রচ্য রঙ্গহিন্দোল
তৈসিয়ে বৃজবধূ বনি
হরি চিতে লোচন কোর।
তৈসোই বৃন্দাধন-বিপিন-
কুঞ্জদ্বার বিহার-
বিপুল গোপী, বিপুল বনগৃহ
রবন নন্দকুমার।
নিত্য লীলা নিত্য আনন্দ
নিত্য মঙ্গল গান,
“সুরসুর মুনি মুখনি অস্তুতি "
ধন্য গোপী কানহা।

BANGLADARSHAN.COM

॥প্রসঙ্গ গোস্বামী তুলসীদাসজী॥

সংক্ষিপ্ত জীবনী :-

****

প্রথম পর্ব:-

******

শ্রীগুরু চরণ সরোজ রজঃ নিজমন মুকুর সুধার
বরনউ রঘুবর বিমল যশ জো দায়ক ফল চার।
বুদ্ধিহীন তনু জানিকে সুমিরো পবন কুমার
বল বুদ্ধি বিদ্যা দেহু মোহে হরহু কলেস বিকার।

-গোস্বামী তুলসীদাস অর্থ-গোস্বামী তুলসীদাসজী বলছেন শ্রীগুরুর চরণকমলের ধূলি দিয়ে নিজের মনের আয়নাকে মুছে রঘুবরের অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের মালিন্যবর্জিত যশ কীর্তন করছি যা চতুর্বর্গ ফল অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, দান করে, আমি বুদ্ধিহীন জেনে আমার গুরু পবনকুমার হনুমানজির গুনগান করে প্রার্থনা করছি আমায় যেন তিনি বল, বিদ্যা, বুদ্ধি দিয়ে ক্লেশ ও বিকার হরণ করেন।

এটি আমরা সবাই জানি "হনুমান চালিসা"র শুরুর পদ যার রচয়িতা গোস্বামী তুলসীদাসজী। এছাড়া রামচরিতমানস এমন একটি গ্রন্থ যা আপামর ভারতীয় জনজীবনে বিপুল প্রভাব ফেলেছে, আমার এই গ্রন্থ এতো প্রিয় যে ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে আমার এই গ্রন্থ আর স্বয়ং তুলসীদাসজী যিনি রামচরিতমানসের রচয়িতা তিনি এক অবতারকল্প মহাত্মা ছিলেন । তাই তাঁর জীবনের কিছু পুণ্যকথা একটু জানতে চেষ্টা করেছি মাত্র।

গোস্বামী তুলসীদাসজী রামানন্দী বৈষ্ণব সাধক কবি,যিনি পরিচিত তাঁর ইষ্ট রামের প্রতি অটুট ভক্তির জন্য। সংস্কৃত এবং আওয়াধি ভাষায় তাঁর অনেক রচনা থাকলেও তাঁকে আমরা চিনি মূলতঃ রামচরিতমানসের রচয়িতা হিসেবে যেটি সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণের আওয়াধি রূপ হিসেবে মানা হয়, যদিও রামচরিতমানসে অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাব স্পষ্ট।

তুলসীদাসজীর রচনার মধ্যে রামচরিতমানস ছাড়া প্রসিদ্ধ বিনয় পত্রিকা, গীতাবলী, দোহাবলী, সাহিত্য রত্ন, হনুমান চালিসা, বৈরাগ্য সন্দীপনী, জানকী মঙ্গল, পার্বতী মঙ্গল ইত্যাদি। তুলসীদাসজীকে সন্ত, অভিনব বাল্মীকি, ভক্ত শিরোমনি প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

“আমি সমগ্র জগতকে প্রণতি জানাচ্ছি করজোড়ে এই মনে করে যে সর্ব জগৎ শ্রীরামচন্দ্র ও সীতামায়েরই প্রতিরূপ”- তুলসীদাসজী তাঁর জীবনের বেশিরভাগটা অতিবাহিত করেনর বারাণসী ও ফয়জাবাদে। বারাণসীর গঙ্গার তুলসী ঘাটের নামকরণ তাঁরই নামে হয়েছে। বারাণসীর সংকটমোচন হনুমানজীর মন্দির তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে তাঁর ইষ্টের দর্শন হয়েছিল। তিনি রামলীলা নাটকের প্রবর্তক, যেটি রামায়ণের লৌকিক যাত্রা রূপে অভিনীত হয়ে থাকে।

তুলসীদাসজীকে মানা হয় হিন্দী, ভারতীয় এবং বিশ্ব সাহিত্যে একজন অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি হিসাবে। তুলসীদাসজী ও তুলসীদাসজীর রচনার অসীম বিস্তারিত প্রভাব রয়েছে ভারতীয় সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে ও সমাজে এবং লক্ষ্যণীয় ভাবে প্রভাবিত হয়েছে রামলীলা, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, জনপ্রিয় সঙ্গীত এবং দূরদর্শনের ধারাবাহিক।

তুলসীদাস নামটি এসেছে দুটি সংস্কৃত শব্দ জুড়ে, ‘তুলসী’ যা ভগবানের বিষ্ণু ও বৈষ্ণবদের প্রিয় বৃক্ষ আর 'দাস' অর্থে সেবক। তুলসীদাসজী নিজের জীবন সম্পর্কে খুবই অল্প ঘটনা ও তথ্য বিবৃত করেছেন। উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত তুলসীদাসজীর জীবন সম্পর্কে দুটি প্রামান্য উৎস ছিল নবদাসজীর ১৫৮৩ থেকে ১৬৩৯ এর মধ্যে লেখা ভক্তমাল গ্রন্থখানি আর প্রিয়দাসের ১৭১২ সালে লেখা ভক্তমালের ওপরে ভাষ্য ভক্তিরসবোধিনী। নবদাসজী ছিলেন তুলসীদাসজীর সমসাময়িক এবং ছয় লাইনে বর্ণনা করেছেন তুলসীদাসজীকে বাল্মীকির জন্মান্তর হিসেবে ।

প্রয়াগের কাছে বান্দা জেলায় রাজাপুর নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে আত্মারাম দুবে নামে একজন বিখ্যাত সরযূতীরবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল হুলসী। ১৫৫৪ সম্বৎ (বঙ্গাব্দ ৯০৫ সাল)। এর শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমীতে মূলা নক্ষত্রে এই ভাগ্যবান দম্পতির জীবনে বারো মাস গর্ভে থাকার পর গোস্বামী তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে বালক তুলসীদাস কাঁদেননি, কিন্তু তার মুখ দিয়ে ‘রাম’ শব্দ বেরিয়েছিল। তার মুখে বত্রিশটি দাঁত ছিল। তাঁর গঠনসৌষ্ঠব পাঁচ বছরের বালকের মতো ছিল। এই অদ্ভুত বালককে দেখে পিতা অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত হয়ে এর সম্বন্ধে নানারকম চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। এই সব দেখে মা হুলসীর বড়ই দুশ্চিন্তা হল। তিনি বালকের অনিষ্টের আশঙ্কায় দশমীর রাতে নবজাত শিশুকে নিজের দাসীর সাথে তার শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন এবং পরের দিন তিনি অসার সংসার ত্যাগ করলেন। দাসীর নাম ছিল ‘চুনিয়া।’ সে অত্যন্ত আদর যত্নের সাথে বালকের পরিচর্যা করল। তুলসীদাসের বয়স যখন প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর, তখন চুনিয়ারও মৃত্যু হল এবং বালক তুলসীদাস অনাথ হয়ে গেল।

সে এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে এ-বাড়ি ও-বাড়ির দরজায় দরজায় তিরস্কৃত হতে লাগল। এইসময় জগজ্জননী পার্বতী দেবীর এই প্রতিভাবান বালকের ওপর দয়া হল। তিনি ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করে প্রতিদিন এই বালকের কাছে এসে তাকে নিজের হাতে ভোজন করিয়ে যেতেন।

এদিকে ভগবান শংকরের ইচ্ছায় রামশৈলের নিবাসী শ্রীঅনন্তানন্দজীর প্রিয় শিষ্য শ্রীনরহরি আনন্দজী এই বালককে খুঁজে বের করে তার নাম রাখলেন রামবোলা। তিনি তাকে অযোধ্যায় নিয়ে গেলেন এবং ১৫৬৯ সম্বতের মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথি শুক্রবারে তার উপনয়ন সংস্কার করলেন। কেউ না শেখালেও বালক রামবোলা গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করল দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। এরপর নরহরি স্বামী বৈষ্ণবের পঞ্চসংস্কার করে রামবোলাকে 'রাম' মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন এবং প্রথম অধ্যায় থেকেই তাকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগলেন। বালক রামবোলার প্রখর বুদ্ধি ছিল। একবার গুরুর মুখ থেকে যা শুনতো সাথে সাথে তাই কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। কিছুদিন বাদে গুরু-শিষ্য দুজনেই সেখান থেকে শূকরক্ষেত্রে পৌঁছান। সেখানে শ্রীনরহরি স্বামী তুলসীদাসকে রামচরিতমানস শোনান। কিছুদিন বাদে তুলসীদাস সেখান থেকে কাশী চলে এলেন। কাশীতে শেষসনাতনজীর কাছে পনের বৎসর পর্যন্ত বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন। এরপর তার মনে সাংসারিক জীবনের কিছু ইচ্ছা জাগে, তিনি তার বিদ্যাগুরুর অনুমতি নিয়ে নিজের জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। সেখানে এসে তিনি দেখেন যে তার ঘর সংসার সব নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি শাস্ত্রমতে নিজের পিতার শ্রাদ্ধ করলেন এবং সেখানে থেকেই সকলকে রামকথা শোনাতে লাগলেন।

সম্বৎ ১৫৮৬ (বঙ্গাব্দ ৯৩৭ সাল) জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী বৃহস্পতিবারে ভরদ্বাজগোত্রীয় এক সুন্দরী কন্যার সাথে তার বিবাহ হয় এবং তিনি নববধূর সাথে সুখে দিনাতিপাত করতে থাকেন। একবার তার স্ত্রী তার ভাই-এর সাথে নিজের মায়ের কাছে যান। তুলসীদাসজীও পেছন পেছন সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। ওঁর স্ত্রী এর জন্য তাকে অত্যন্ত ভৎসনা করেন এবং বলেন, "আমার এই রক্তমাংসের শরীরে তোমার যে আসক্তি এর অর্ধেকও যদি তুমি ভগবানকে দিতে তাহলে তোমার বন্ধন মুক্তি হয়ে যেত।" কথাটা তুলসীদাসের মনে লেগে গেল। একমুহূর্তও বিলম্ব না করে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে গেলেন।

সেখান থেকে তুলসীদাস প্রয়াগে আসেন। সেখানে তিনি গৃহস্থবেশত্যাগ করে সাধুবেশ ধারণ করেন। তারপর নানা তীর্থ পর্যটন করে আবার কাশী এসে পৌঁছান। মানস সরোবরের তীরে তিনি কাকভূশণ্ডীর দর্শন লাভ করেন।

কাশীতে তুলসীদাসজী রামকথা গান করতে লাগলেন। সেখানে একটি গাছে রোজ তুলসীদাসজী শৌচ কর্ম সারার পরে জল ঢালতেন যেটি সেই গাছে থাকা প্রেত পান করতো, এভাবে তার মুক্তির সময় আসলে সে তুলসীদাসজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বর দিতে চাইলে তার কাছে রামদর্শনের বর প্রার্থনা করেন তুলসীদাসজী, সে তখন তাকে হনুমানজীর সন্ধান দিয়ে দেয় যে রামকথা যেখানে পাঠ হয় সেখানে সবার আগে আসে আর সবার শেষে যায়। হনুমানজীকে দর্শন করে তুলসীদাস তার কাছে রঘুনাথের দর্শন প্রার্থনা করেন। হনুমানজী বলেন, "চিত্রকূটে তোমার সঙ্গে তার দেখা হবে। তখন তুলসীদাস চিত্রকূট যাত্রা করেন। চিত্রকূট পৌঁছে তিনি রামঘাটে তাঁর আসর বসালেন। একদিন তিনি পরিক্রমা করতে বেরুলেন। পথে তার শ্রীরামের দর্শন হয়। তিনি দেখেন যে অতি সুন্দর দুই রাজকুমার ধনুর্বাণ হাতে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন। তিনি তাদের দেখে মুগ্ধ হয়ে যান কিন্তু তাদের চিনতে পারেননি। পেছন থেকে হনুমানজী এসে তাকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, তখন তার আর অনুতাপের সীমা রইল না। হনুমান তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে প্রাতঃকালে তার আবার দর্শন হবে।

১৬০৭ সম্বৎ (৯৫৮ বঙ্গাব্দ) মৌনী অমাবস্যা বুধবার ভগবান শ্রীরাম আবার তুলসীদাসের সামনে আবির্ভূত হন। তিনি বালকরূপে তুলসীদাসকে বললেন, বাবাজী! আমায় একটু চন্দন দাও তো! হনুমান ভাবলেন যে তুলসীদাস এবারও যেন আর ভুল না করে! তোতাপাখির রূপ ধরে তিনি তখন এই দোহাটি বললেন-

চিত্রকূট কে ঘাট পর ভই সন্তন কে ভীর॥
তুলসীদাস চন্দন ঘির্সে তিলক দেত রঘুবীর॥

তুলসীদাস সেই মনোহর মূর্তি দেখে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন।ভগবান শ্রীরাম নিজের হাতে চন্দন নিয়ে নিজের কপালে এবং পরে তুলসীদাসের কপালে ফোঁটা দিয়ে অন্তর্ধান করলেন।

১৬২৮ সম্বতে (৯৭৯ বঙ্গাব্দ) হনুমানজীর নির্দেশে তিনি অযোধ্যায় পাড়ি দেন। তখন প্রয়াগে মাঘমেলা হচ্ছিল। তিনি কয়েকদিন সেখানে থেকে গেলেন। উৎসবের ছয় দিন পরে একটি বটগাছের নীচে তিনি ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক্য মুনির দর্শন পান। শূকরক্ষেত্রে তিনি নিজের গুরুর মুখে যে কাহিনী শুনেছেন সেদিন সেইসময় সেই রামচরিতমানসেরই আলোচনা হচ্ছিল। সেখান থেকে তিনি কাশী চলে যান এবং প্রহ্লাদঘাটে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে থাকতে লাগলেন। সেখানে তার ভেতরকার কবিশক্তির প্রকাশ হয় এবং তিনি সংস্কৃত ভাষায় পদ্য লিখতে থাকেন। কিন্তু দিনেরবেলা তিনি যেসব কবিতা লিখতেন।

রাত্রিবেলা সেগুলি মুছে যেত। এই ঘটনা রোজ ঘটত। অষ্টমদিনে তুলসীদাস এক স্বপ্ন দেখেন যে দেবাদিদেব মহাদেব তাকে নিজের ভাষায় কাব্য রচনার নির্দেশ দিচ্ছেন, তার স্বপ্ন ভেঙে গেল তিনি উঠে বসলেন। সেই মুহূর্তে হর-পার্বতী তার সামনে আবির্ভূত হলেন। তিনি তাদের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। মহাদেব বললেন ‘তুমি অযোধ্যায় গিয়ে বাস করো এবং হিন্দীভাষায় কাব্য রচনা করো। আমার আশীর্বাদে তোমার কাব্য সামবেদের সমান ফলবতী হবে। এই কথা বলে গৌরী ও শংকর ভগবান অন্তর্ধান করলেন। এই নির্দেশ অনুসারে তুলসীদাস কাশী থেকে অযোধ্যায় চলে আসেন।

১৬৩১ সম্বতের (৯৮২ বঙ্গাব্দ) শুরুতে রামনবমীর দিন প্রায় সেইরকমই গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশ ছিল যেমন ছিল ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিনে। সেইদিন সকালবেলা তুলসীদাস রামচরিতমানসের রচনা আরম্ভ করেন। দুই বছর সাত মাস ছাব্বিশ দিনে গ্রন্থ লেখা শেষ হয়। ১৬৩৩ সম্বতের (৯৮৪ বঙ্গাব্দ) অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে রামবিবাহের দিন সাতটি কাণ্ড সমাপ্ত হয়। এরপর ভগবানের নির্দেশে তুলসীদাস কাশী চলে এলেন। সেখানে বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণাকে রামচরিতমানস শ্রবণ করান। রাত্রিবেলা পুস্তকটি বিশ্বনাথের মন্দিরে রেখে দিলেন। সকালবেলা যখন পুস্তকের আবরণ খোলা হল তখন দেখা গেল পুস্তকের ওপরে লেখা –‘সত্যম শিবম্ সুন্দর’ আর নীচে বাবা বিশ্বনাথের স্বাক্ষর। সেইসময় উপস্থিত জনেরা ‘সত্যম্ শিবম্ সুন্দর এই ধ্বনিও শোনেন।

পণ্ডিতেরা যখন এ ঘটনা শুনলেন তখন তাদের মধ্যে ঈর্ষার উদ্রেক হল। তারা সমবেতভাবে তুলসীদাসের নিন্দা প্রচারে তৎপর হলেন এবং বইটি নষ্ট করার চেষ্টাও করতে লাগলেন। বইটি চুরি করার জন্য তারা দুটো

চোরকেও নিযুক্ত করলেন। চোরেরা চুরি করতে গিয়ে দেখে যে তুলসীদাসের বাড়ির চারপাশে দুই বীরপুরুষ ধনুর্বাণ নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।এই পুরুষ দুটি সুদর্শন শ্যাম ও গৌরবর্ণ। এঁদের দর্শনে চোরেদের বুদ্ধিও শুদ্ধ হয়ে গেল। সেইদিন থেকে তারা চুরি করা ত্যাগ করল এবং ভজন-কীর্তনে মন দিল। তার লেখা বইটি রক্ষার জন্য ভগবান কষ্ট করে পাহারা দিচ্ছেন বুঝতে পেরে তুলসীদাস তার সব জিনিসপত্র বিলিয়ে দিলেন।
এবং বইটি তার বন্ধু টোডরমলের কাছে রেখে দিলেন। এরপর তিনি একটি দ্বিতীয় কপি লিখলেন। সেই প্রতিলিপির পশ্চাৎপটের ওপর অন্যান্য প্রতিলিপি তৈরি হতে লাগল। পুস্তকের প্রচার দিনের পর দিন বাড়তেই থাকল।

এদিকে পণ্ডিতেরা অন্য কোনও উপায় না দেখে সেই পুস্তকটি শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর কাছে পাঠালেন তার মতামতের জন্য। মধুসূদন সরস্বতী বইটি দেখে অত্যন্তই আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং লিখলেন–

আনন্দকাননে হ্যস্মিঞ্জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিতামঞ্জরী ভাতি রামভ্রমরভূষিতা॥

‘এই কাশীরূপী আনন্দকাননে তুলসীদাস হলেন চলমান তুলসীগাছের চারা। তাঁর কবিতারূপী মঞ্জরী অতীব সুন্দর, যার ওপর শ্রীরামরূপী ভ্রমর সর্বদা গুণগুণ করে বেড়ান।

এতেও পণ্ডিতেরা খুশি হলেন না। তখন তারা এই বইয়ের পরীক্ষার আর এক উপায় স্থির করলেন। বাবা বিশ্বনাথের সামনে সবার ওপরে বেদ, তার নীচে শাস্ত্র, শাস্ত্রের নীচে পুরাণ এবং সকলের নীচে রামচরিতমানস রেখে দেওয়া হল এবং মন্দিরের দরজা বন্ধ করে রাখা হল। ভোরবেলা মন্দির খুলে দেখা গেল যে শ্রীরামচরিতমানস বেদেরও ওপরে বসে আছেন। এতে পণ্ডিতেরা বড়ই লজ্জায় পড়লেন। তারা গিয়ে তুলসীদাসের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং ভক্তিভরে তার চরণামৃত পান করলেন।

এরপর থেকে তুলসীদাসী অসীঘাটে বাস করতে লাগলেন। একদিন রাত্রে কলিযুগ মুর্তিধারণ করে তার কাছে এল এবং ভয় দেখাতে থাকল।

গোস্বামীজী হনুমানকে স্মরণ করলেন। হনুমানজী তাকে বিনয়ের পদ রচনা করতে বললেন; অতঃপর গোস্বামীজী বিনয়-পত্রিকা লিখলেন এবং ঈশ্বরের চরণে তাকে সমর্পণ করলেন। শ্রীরামচন্দ্র সেই বই-এর ওপর নিজে স্বাক্ষর করে দিলেন এবং তুলসীদাসকে অভয় দিলেন।

১৬৮০ সম্বতে (১০৩১ বঙ্গাব্দে) শ্রাবণ কৃষ্ণ তৃতীয় শনিবার অসীঘাটের ওপর রাম নাম জপ করতে করতে গোস্বামীজী দেহত্যাগ করলেন।

তুলসীদাসজীর রামচরিতমানসে দেওয়া কিছু উপদেশ ও রামায়ণের রাবণ চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট:-

সনাতন ধর্মে নারীকে শক্তিস্বরূপা জ্ঞান করা হয়। ভারতীয় সমাজে দেবীশক্তি বিশাল আকারে পূজিত হলেও এদেশের নারীরা আজও সহস্র অবমাননার মধ্যে দিন কাটান। আজও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে নারী অবদমন এদেশে নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু সত্যিই কি শাস্ত্র এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়? আজ পর্যন্ত কোনো শাস্ত্র নেই যেখানে নারী-পীড়নকে সিদ্ধ বলা হয়েছে। গোস্বামী তুলসীদাস তাঁর মহাকাব্য 'রামচরিতমানস'-এ কেবল মাত্র রামকথাকেই লেখেননি, হাজার হজার বছরের ভরতীয় ঐতিহ্যকে, নীতিবোধকেও সেই সঙ্গে বুনে গিয়েছেন। এই মহাগ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে নারীদের প্রতি অবমাননা প্রদর্শনকারীদের সর্বনাশ বিষয়ে।

গোস্বামী তুলসীদাস ৪ নারীকে দেবী লক্ষ্মীর অবতারস্বরূপা জ্ঞান করেছেন। এবং জানিয়েছেন, এই চার প্রকার নারীকে অবমাননা করলে পুরুষের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

• পুত্রবধূ– পুত্রবধূ সংসারের শ্রীকে ধরে রাখেন। বংশকে গতি প্রদান করেন। সেই কারণে তিনি শ্রদ্ধেয়া। তাঁর প্রতি কোনও রকম অসম্মান প্রদর্শন সংসারকে ছারখার করে দিতে পারে।

• ভ্রাতৃজায়া– বড় ভাইয়ের স্ত্রীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন বস্তুত নিজের মা-কে অপমানেরই সামিল। আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী পূত্রবধূরই তুল্য। সে কারণে এঁদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন মহাপাপ

• ভগিনী– ভগিনীকেও তুলসীদাস মাতৃসমা বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁকে অসম্মান করা মানে নিজের কুলকে অসম্মান করা।

• কন্যা– তুলসীদাস কর্তৃক প্রদত্ত তালিকার সব শেষে রয়েছে কন্যা। পিতা ও কন্যার সম্পর্ককে পবিত্রতম বলে মনে করছেন কবি তুলসীদাস। তাকে অবমাননা করার অর্থ নিজেকেই অবমাননা করা, এমনই মত গোস্বামীজির। 'রামচরিতমানস'-এর মূল কাহিনিকাঠামোতেও বার বার উঠে এসেছে এই প্রসঙ্গ। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকে সামনে রেখে গোস্বামী জানিয়েছেন নৈতিক বিধানগুলিকে। নারী তাঁর কাছে অতি পবিত্র। তাঁর রামকথা-তেও তাই সেই দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত।

ধনলাভের রহস্য কী– লক্ষ্মণের এই প্রশ্নের উত্তরে রাম জানিয়েছিলেন, কোন কোন ব্যক্তি জীবনে ধনী হতে পারেন না। বলাই বাহুল্য, এই উপদেশ দোঁহার আকারেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। কী রয়েছে সেই উপদেশে? আসমুদ্রবিমাচল এই ভূখণ্ডে তুলসীদাস নামটি গণচৈতন্যে ধৃত হয়ে রয়েছে আর একটি কারণে। সেই কারণটি তাঁর নামে প্রচলিত দোহাবলি। দুই পংক্তির আশ্চর্য সব কবিতার মধ্যে ধরা রয়েছে নৈতিকতার সদানবীন পাঠ। এই কবিতাগুলি সত্যিই তুলসীদাসের রচনা কি না, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও একথা বলাই যায়, তাঁর নামে প্রচলিত এই আপ্তবাক্যগুলির অন্তর্নিহিত সত্যতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেননি কয়েকশো বছরেও।

অনেক সময়ে তুলসী- দোঁহাবলী নিহিত থেকেছে ‘রামচরিতমানস’-এর মধ্যেই। রামচন্দ্রের মুখ নিঃসৃত উপদেশ হিসেবে গণ্য হয়েছে এই সব নীতিকথা।

ধনলাভের রহস্য কী– লক্ষ্মণের এই প্রশ্নের উত্তরে রাম জানিয়েছিলেন, কোন কোন ব্যক্তি জীবনে ধনী হতে পারেন না। বলাই বাহুল্য, এই উপদেশ দোহার আকারেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। কী রয়েছে সেই উপদেশে, জানা যেতে পারে।

• নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি কখনও ধনী হতে পারে না। নেশাই তার যাবতীয় উপার্জনকে ডুবিয়ে দেবে।

• যে বণিক তার অংশীদারদের ঠকানোর মানসিকতা বহন করে, সে কখনওই ধনী হতে পারে না।

• অতিরিক্ত লোভী ব্যক্তির বিপুল ধনলাভ সম্ভব নয়। লোভ তাকে পিছনে টেনে রাখে।

• অন্যের প্রতি দুর্ব্যবহারকারী ব্যক্তি ধনী হতে পারে না।

• উদ্ধত ব্যক্তির পক্ষে ধনী হওয়া অসম্ভব। হয়তো এই কহাবত গণমানসেরই প্রতিফলন। যে কোনও ধর্ম, যে কোনও সুষম সমাজেই এই নৈতিকতা বজায় থাকে। এখানে তুলসীদাস তাকেই মান্যতা দিয়ে গিয়েছেন। রামায়ণ-এ বর্ণিত মোক্ষকথা খুবই সাংকেতিক। উত্তরিত চেতনাসম্পন্ন পাঠক ছাড়া এর মর্মোদ্ধার কেউ করতে পারবেন বলে মনে হয় না। দেখা যাক, কী বলছে রামায়ণ-সংকেত।

• ‘রাম’ শব্দের অর্থ ‘আত্মা’, ‘অয়ন’ অর্থে ‘যাত্রা’। সুতরাং নাম থেকেই বোঝা যায়, এই গ্রন্থ বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তির কথাই ব্যক্ত করে। ব্যক্ত করে আত্মোপলব্ধির যাত্রাপথ।

• ‘দশরথ’ শব্দটিকে নিয়ে যদি ভাবা যায়, দেখা যাবে, এর আক্ষরিক অর্থ– এমন এক ব্যক্তি, যিনি দশটি রথের সওয়ার। এই নামটির আড়ালে রয়েছে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের উপরে নিয়ন্ত্রণের কথা। দশেন্দ্রিয়কে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই ‘দশরথ’।

• রাজা দশরথের তিন রাণি–কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রা। এই তিন স্ত্রীশক্তি আসলে তিন নাড়ি ইড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্নার প্রতীক।

• আগেই বলা হয়েছে, ‘রাম’ শব্দের অর্থ আত্মা। তিনি আসলে শুদ্ধতা ও শান্তির প্রতীক। আত্মা অবিনশ্বর, তার সৃষ্টি বা লয় নেই।

• ‘সীতা’ কুণ্ডলিনী শক্তির মূর্ত প্রতীক। তিনি প্রকৃতির সারাৎসার।

• ‘লক্ষ্মণ’ শব্দের অর্থ এক বিশেষ বিন্দুতে আত্মসমর্পণ। এই সমর্পণই সত্তাকে মোক্ষের দিকে নিয়ে যায়।

• ‘হনুমান’ সৎ চিত্তবৃত্তি এবং বৌদ্ধিক উৎকর্ষের মূর্তরূপ। পবনপুত্র প্রাণশক্তিকে সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিতকরণের প্রক্রিয়াকে ব্যক্ত করেন। কুণ্ডলিনীস্বরূপা সীতার পদে হনুমানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ চিত্তবৃত্তির পরম লক্ষ্যে লীন হওয়াকেই বোঝায়।

• ‘রাবণ’ অহংকার ও অজ্ঞানতার প্রতীক। রাবণের স্বর্ণলঙ্কাকে মূলাধার চক্র বলে মনে করা হয়, যেখানে পশুপ্রবৃত্তি, অচেতনতা, বাসনা বাস করে। একে বিনাশ না করে জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হওয়া যায় না।

• রামায়ণ-এ উল্লিখিত বিভিন্ন স্থাননাম– অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধা, রামেশ্বরম, সমুদ্র, লঙ্কা ইত্যাদিরও গোপন ব্যঞ্জনা রয়েছে। অযোধ্যা আজ্ঞাচক্রের, অরণ্য বিভ্রান্তির প্রতীক। কিষ্কিন্ধা বিশুধি চক্রের প্রতীক, যেখানে অমৃত ও হলাহল একত্রে অবস্থান করে। সেক্ষেত্রে হলাহল বালীতে এবং অমৃত সুগ্রীবে প্রতীকায়িত হয়। রামেশ্বরম আসলে মণিপুরচক্র, এখানে রামরূপী আত্মা শক্তিকে আহবান করে। সমুদ্র আসলে স্বাধীষ্ঠান চক্র এবং লঙ্কা মূলাধার। চক্রের প্রতীক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মানব দেহের মধ্যেই সমগ্র রামায়ণ-এর অবস্থান। এইবার জান যে, বুঝ সন্ধান।

তুলসীদাসী রামায়ণ রামচরিতমানসের লঙ্কা কাণ্ডে যেখানে রামচন্দ্র সবে গিয়ে লঙ্কায় পৌঁছেছেন আর রাবণ রামকে সাধারণ মনুষ্য ভেবে তুচ্ছ করছেন, সেখানে এক জায়গায় তুলসীদাসজী বলছেন যে বৈদ্য, মন্ত্রী আর গুরুর উপদেশ যদি রাজার কাছে গুরুত্ব না পায়, তাহলে বৈদ্য যে শরীরকে চিকিৎসা করছেন, মন্ত্রী যে রাজ্যকে মন্ত্রণা দিচ্ছেন আর আর গুরু যে ধর্মের রক্ষা করছেন, সেই তিনটিরই অবনতি সেখানে সেই রাজ্যে অনিবার্য ।

মহাকাব্য ‘রামায়ণ’-এ লঙ্কাধিপতি রাবণকে কখনওই সম্পূর্ণ ভিলেন হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়নি। বরং একথা বলা যায়, রাবণ রামায়ণ-কাহিনির অ্যান্টাগনিস্ট। এই বিশেষ চরিত্রটিকে ঘিরে এত বেশি কথা, উপকথা এবং অতিকথা এই ভারতভূমে আবর্তিত হয়েছে যে, রামায়ণের বর্ণনাই অনেক সময়ে চলে গিয়েছে অন্তরালে। রাবণ হয়ে উঠেছেন এক পরিপূর্ণ খলনায়ক। কিন্তু রামায়ণ অনুসরণেই বলা যায়, রাবণ অজস্র গুণে গুণান্বিত এক ব্যক্তিত্ব। কিছু দুর্বলতা হেতু তাঁর পতন ঘটে–এই মাত্র।

এখানে রাবণ চরিত্রের তেমন কয়েকটি দিকের কথা তুলে ধরা হল, যা সাধারণত আলোচনার আওতায় আসে না।

১. শাসক হিসেবে রাবণকে কোথাও অপশাসক বা নিষ্ঠুর বলা হয়নি। তিনি স্বর্ণলঙ্কার অধিপতি। ফলে বোঝাই যায়, এক সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য তিনি শাসন করতেন। আর সুশাসন ছাড়া সমৃদ্ধি সম্ভব নয়, এ কথা কে না জানে!

২. যুদ্ধক্ষেত্রে আহত অবস্থায় পড়ে থাকাকালীন অবস্থায় রাবণকে দেখতে যান লক্ষ্মণ। রাবণ তাঁকে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান দান করেন। তবে রাবণের আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল 'রাজধর্ম' কী এবং কীভাবে তা পালন করতে হয়।

৩. রাবণ ছিলেন এক অসামান্য বীণাবাদক। তিনি নিজেই তাঁর বীণার নকশা করেছিলেন। তিনি 'শিব তাণ্ডব' স্তোত্রেরও রচয়িতা।

৪. রাবণ পরম শিবভক্ত ছিলেন। রাবণকে শিব এক আশ্চর্য বর দান করেন। সেই বরে তিনি প্রায় অমরত্ব প্রাপ্ত হন।

৫. রাবণ ছিলেন এক দক্ষ চিকিৎসক। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। 'নাড়ি পরীক্ষা', 'অর্ক শাস্ত্র', 'অর্ক পরীক্ষা' প্রভৃতি বিখ্যাত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রগ্রন্থ রাবণ কর্তৃক লিখিত বলে প্রচলিত। ক্ষত চিকিৎসায় তাঁর অবদানের কথা আজও আয়ুর্বেদ স্বীকার করে।

৬. রাবণের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল ভুবনবিদিত। চার বেদ এবং ছয় উপনিষদ তাঁর নখদর্পণে ছিল।

৭. জ্যোতির্বিদ্যায় রাবণের বিশেষ দখল ছিল। একথা রামায়ণে বার বার উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি নাকি গ্রহতারকাদের নির্দেশ দিতেও পারতেন। আসলে তিনি গ্রহতারকার ভবিষ্যৎ অবস্থান অনর্গল বলে যেতে পারতেন।

৮. রাবণ এবং তাঁর ভাই কুম্বকর্ণ ছিলেন বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক। তাঁরা ব্রহ্মকুমারদের দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত হন। তাতেই তাঁদের রাক্ষসজন্ম ঘটে।

৯. রাবণকে ত্রিলোকের অধীশ্বর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে বহু স্থানে। সুতরাং তাঁর ক্ষমতা যে কোনও নৃপতির থেকে অনেক বেশি ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

১০. অন্ধ্র প্রদেশের কাকিনাড়ায় রাবণ ও শিবলিঙ্গ একত্রে পূজিত হন। এ থেকে বোঝা যায়, গণস্মৃতিতে রাবণ চিরকালই খলনায়ক ছিলেন না।

তুলসীদাসী রামায়ণের লঙ্কা কাণ্ডে যেখানে রামচন্দ্র সবে গিয়ে লঙ্কায় পৌঁছেছেন আর রাবণ রামকে সাধারণ মনুষ্য ভেবে তুচ্ছ করছেন, সেখানে এক জায়গায় তুলসীদাসজী বলছেন যে বৈদ্য, মন্ত্রী আর গুরুর উপদেশ যদি রাজার কাছে গুরুত্ব না পায়, তাহলে বৈদ্য যে শরীরকে চিকিৎসা করছেন, মন্ত্রী যে রাজ্যকে মন্ত্রনা দিচ্ছেন আর আর গুরু যে ধর্মের রক্ষা করছেন, সেই তিনটিরই অবনতি সেখানে অনিবার্য।

আকবর বাদশা আবদুর রহিমের ভাষ্য শুনে শুধু খুশি হয়েছিলেন, এ কথা বলা বাহুল্য। কেননা এই মানুষটাকে তিনি চিনেছিলেন এমনই বিরাট এক সাংস্কৃতিক মধ্যস্থ হিসেবে, যিনি শাসকের আরবি-ফারসির ধ্রুপদী ঘরানার মধ্যে সংস্কৃত, হিন্দি, অবধি তথা 'খারি বোলি'র এমন আন্তরিক মিশ্রণ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন যে, ভারতীয় পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীরা আবদুর রহিমকে তাঁদেরই একজন বলে মনে করতেন। তা নইলে রামচরিতমানসের মানস-হংস তুলসীদাসকে আবদুর রহিম সেই জবাব দিতে পারতেন না, যা সত্যি বলতে কী তুলসীদাসেরই বচন হতে পারত। আমরা বলতে চাই, ভারতীয় ধর্ম-দর্শন যাঁর আপন সংস্কারের মধ্যে রয়েছে, তিনি যে কথা সহজে বলতে পারেন, সেটা যদি তাঁর চেয়েও সহজে একজন মুসলমান বলতে পারেন, তবে তাঁর নাম হওয়া উচিত আবদুর রহিম।

ভারতবর্ষের মধ্যযুগে তুলসীদাসের মতো মহাকবি দ্বিতীয় ছিলেন কিনা সন্দেহ। অবধি ভাষায় রামায়ণ লেখা ছাড়াও তিনি আরও যে ক'খানা গ্রন্থ লিখেছেন, তার মধ্যে একটি হল বরবৈ ছন্দে লেখা রামায়ণ– ছন্দের নামেই বইটার নাম– বরবৈ রামায়ণ।

এটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি গ্রন্থ এবং গোস্বামী তুলসীদাসের কাব্যরচনার অসামান্য শৈলীও তত প্রস্ফুটিত নয় এখানে। কিন্তু এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই অতিসংক্ষিপ্ত রামায়ণ রচনার ছন্দ– বরবৈ। আমাদের দিক থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হল– তুলসীদাস সম্ভবত এই বরবৈ ছন্দে তাঁর রামায়ণ-রচনার উৎসাহ পান আবদুর রহিমের কাছ থেকে। এ কথার প্রমাণ আছে বেণীমাধব দাস নামে তুলসীদাসের এক শিষ্যের লেখায়।

বেণীমাধব দাসই বোধহয় সম্ভবত প্রথম সেই মানুষ, যিনি তুলসীদাসের খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে তাঁর একটি জীবনী লেখেন। সেই জীবনীগ্রন্থের নাম 'গোসাই-চরিত'। এই 'গোসাই-চরিত' গ্রন্থের এক জায়গায় বেণীমাধব লিখেছেন– কবি আবদুর রহিম বরবৈ ছন্দে নিজে কবিতা লিখে মুনিস্বরূপ তুলসীদাসের কাছে পাঠিয়ে বলেছিলেন– আমি চাই সুন্দর ছন্দটায় তুমি তোমার লেখা লেখ এবং তার পর সকলের কাছে প্রকাশ কর সেই কবিতা–

'কবি রহীম বরবৈ রচে পঠ্যে মুনিবর পাস।
লখি তেই সুন্দর ছন্দমেঁ রচনা কিয়েউ প্রকাশ॥'

গোসাই-চরিতে এটাও বলা আছে যে, আবদুর রহিম দু-চার কলি দোহা লিখে তুলসীদাসকে বরবৈ ছন্দে কবিতা লেখার মজা বুঝিয়েছিলেন। তুলসী তাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে একটা অতিসংক্ষিপ্ত রামায়ণ রচনা করেছিলেন– এবং সেটা আমরা মনে করি শুধুমাত্র তাঁর কবিবন্ধুর মন রাখার জন্য, কেননা তিনি জানতেন যে, বরবৈ ছন্দে কবিতা লেখার 'মাস্টার' হলেন রহিম। তাঁর নিজের মুখেই তাঁর পছন্দের প্রমাণ দিয়েছেন রহিম। তিনিই লিখেছিলেন– অতি-সাধারণ কবিতাই হোক অথবা দোহা হোক, এমনকী চৌপাই ছন্দেরও কোনও তুলনা হয় না এই বরবৈ ছন্দের সঙ্গে। রহিম তাই লিখেছেন, 'ইয়হ বরবৈ রসকন্দ।'

তবে কিনা আবদুর রহিমের বরবৈ-প্রীতির প্রতি অনেক শ্রদ্ধা রেখেই বলি– তিনি এতটাই বহুভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত যে, তিনি নিজেকেই নিজে চিনতে পারেননি। আমরা বোধ করি– আকবরের সময়ে মুঘল রাজসভাটা হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, তার মূল কারণ ছিলেন এই খান-ই-খানান আবদুর রহিম।

ভারতের সংস্কৃতি, ভারতীয় ধর্মের দার্শনিক বোধ এবং ভারতের ভাষা– এই তিনটিই আবদুর রহিম এমন আত্মগত বুদ্ধিতে গ্রহণ করেছিলেন যে, অনেক উচ্চমার্গের ভারতীয় সাধক পর্যন্ত তাঁর সমস্থানে জায়গা পাবেন না। আর তেমনই ছিলেন অসাধারণ এক মানুষ এই আবদুর রহিম, যাঁর এক-একটা সাধারণ কর্মভঙ্গিও এখন প্রবাদ হয়ে গেছে।

তুলসীদাস এটা জানতেন যে, আবদুর রহিম সাহেবের কবিতার বিষয় অনেক, কিন্তু সব কিছুর ওপরে কৃষ্ণলীলার বিষয়ে তাঁর আবেশ ছিল সবচেয়ে বেশি। আবদুর রহিমের আর এক অভ্যাস ছিল অকাতরে দান করা, আর এই অভ্যাসের কথাও তুলসীদাস জানতেন।

তুলসীর কৌতূহল ছিল এইখানেই– অবশ্য সেই আবদুর রহিমের দানসামগ্রী নিয়ে নয়, কৌতূহল ছিল তাঁর দানের পদ্ধতি নিয়ে, দানের সময়ে রহিমের আঙ্গিক বৈচিত্র্য নিয়ে। এক সদ্ভাবিত মানুষের মাধ্যমে তুলসী বন্ধু আবদুর রহিমকে লিখে পাঠালেন– দান করার এই অদ্ভুত কায়দা আপনি কোথা থেকে শিখলেন, মশাই? সর্বত্র শুনে থাকি যে, দান করার সময় আপনি আপনার দুই হাত ওপরে তুলে তার পর দানসামগ্রী দেন, অথচ যাঁকে আপনি দান করেন, তাঁর দিকে একবারও আপনি তাকান না, আপনার মাথা-চোখ সব নোয়ানো থাকে নীচের দিকে– জ্যোঁ জ্যোঁ কর উঁচ্যো করো, ত্যোঁ ত্যোঁ নিচে নৈন।

রহিম যা করেন, সেটা কেন করেন, সেটা তুলসীদাসের মতো ব্যঞ্জনা-রসিকের না জানা থাকার কথা নয়, তবু এই প্রশ্ন তিনি করেছিলেন যাতে আবদুর রহিমের বিনয়শিক্ষাটুকু লোকতন্ত্রে আখ্যাপিত করা যায়।
আবদুর রহিম লিখেই জবাব দিয়েছিলেন তুলসীদাসকে। তিনি বলেছেন– দ্যাখো ভাই, দেনেওয়ালা হলেন আর একজন, তাঁর জিনিস তিনিই দিচ্ছেন এবং দিন-রাতই দিচ্ছেন। কিন্তু এই দুনিয়ার লোকের স্বভাব হল– তারা ভাবে আমি দিচ্ছি, তারা আমাকে এক দানবীরের মর্যাদা দেবার চেষ্টা করে। এটা দেখে আমার লজ্জা করে বলেই আমি হাত দু'টি উঁচুতে রেখে বোঝাতে চাই যে, দেনেওয়ালা হলেন তিনি যিনি ওপরে আছেন, আর এই জায়গায় লোকে আমাকেই দাতা ভেবে বসে বলে সেই লজ্জায় আমি নীচের দিকে তাকিয়ে থাকি শুধু এই ভেবে যে, আসল দেনেওয়ালা কে? আর দিচ্ছে কে–

দেনহার কৌই অওর হৈ, ভেজত জো দিন-রইন্।
লোগ্ ভরম হম পর করে, তাসো নিচে নইন্।

এই স্বল্পশাব্দিক কথোপকথন কতটা ঐতিহাসিক সত্য বহন করে সেটা নিশ্চয় করা কঠিন, তবু আজকের দিনে orality-র মূল্য তৈরি হয়েছে বলেই তুলসীদাসের সঙ্গে আবদুর রহিমের সম্পর্কটা অবিশ্বাস করার উপায় নেই আমাদের।

তুলসীদাসের জীবনযাত্রার মধ্যেও আবদুর রহিমের কিছু সুখস্পর্শ আছে বলে অনেকেই মনে করেন। তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' যেহেতু মহাকাব্যিক ব্রাহ্মণ্যের বাইরে অন্য এক উদার অবহাস তৈরি করেছিল, তাই সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরাও যেমন তুলসীদাসের জীবনযাত্রা অতিষ্ঠ করে দিয়েছিলেন, তেমনই মঠ-মন্দিরের সেবায়েত সাধু-মহান্তরাও তুলসীদাসকে মন্দির-চত্বরে প্রবেশ করতে দিতেন না। তিরস্কারে আর বহিষ্কারে শ্রান্ত-ক্লান্ত তুলসীদাস কবিতায় লেখেন– এই তুলসীদাস শুধু রামচন্দ্রের গোলাম। দুর্জনেরা যা ইচ্ছে বলুক আমাকে– আমি ভিক্ষা মেগে খাই, শুয়ে থাকি মসজিদে, কারও সঙ্গে আমার কোনও লেনা-দেনা নেই। আমি কারও কাছ থেকে এক পয়সা নিইও না, কিংবা কাউকে দু-পয়সা দিইও না–

মাগি কৈ খৈবো মসীতকো সৌইবো,
লৈবোকো একু ন দৈবে কো দৌউ।

এই কবিতায় উল্লিখিত 'মসীতকো' কথাটিকে কোনও সমৃদ্ধ অনুবাদকই 'মসজিদে'না বলে অন্য অর্থ করতে পারেননি। আর orality-র উপাদান এইখানেই যে, অনেকেই মনে করেন যে, অন্য কোনও জায়গা না পেলে মসজিদে শুয়ে থাকার পরামর্শটা নাকি আবদুর রহিমের। হয়তো বা সেই পরামর্শ তুলসীর কাছে অত্যন্ত মর্যাদার এবং বরাভয়ের কারণ ছিল।

আবদুর রহিম খান-ই-খানান কত না পণ্ডিত-কবির সহায়তা করেছিলেন নিজের সময়কাল জুড়ে– তার ফিরিস্তি না দিয়েও বলতে পারি যে, তাঁদের এক-একজনের জীবনের মধ্যেও তিনি আন্তরিক ভাবে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, তা না হলে মা-বাপ মরা তুলসীদাসের সম্বন্ধে এমন দোহা কেউ রচনা করতে পারতেন না।

তুলসীদাস পরাশর-গোত্রের সরবরিয়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর বাবার নাম ছিল আত্মারাম আর মায়ের নাম ছিল হুলসী (তুলসী)। দু'জনেই অকালে দেহ রেখেছিলেন বলে তুলসীদাসের মধ্যে দুঃখ এবং হতাশাও ছিল অনেক। তার বিনয় পত্রিকা গ্রন্থে তিনি লিখেছেন– আমি জনক-জননীর ত্যাজ্য হয়ে জন্মেছি, কোনও কর্ম ছাড়াই বিধাতা সৃষ্টি করেছেন আমাকে–'জনক-জননী তজ্যো জনমি/করম বিনু বিধিহু সৃজ্যো অবডেরে।' অন্যত্র আরও পরিষ্কার করে লিখেছেন তুলসীদাস যেখানে তাঁর ভাষায় 'নিরালা'র সুর ধরা পড়ে। লিখেছেন– মাতা-পিতা কবেই ত্যাগ করে গেছেন আমাকে। আর বিধাতাও কিছু ভালো লিখে যাননি আমার কপালে– 'মাতু পিতা জল জাই তজ্যা। বিধিহূ ন লিখ্যো কছু ভাল-ভলাই।'

তুলসীদাসের এই নৈরাশ্যের মধ্যে আবদুর রহিম তুলসীদাসের মায়ের নাম নিয়ে লেখেন– স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল যেখানেই হোক সকলেই চায় যেন এই রকম একটা ছেলে হয়।

তুলসীদাসের মা হুলসী যখন তাঁর ছেলেটিকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ান, তখন সুর-নর-নাগ সকলেই চায় তুলসীর মতো একটি ছেলে হোক–

সুরতিয়, নরতিয়, নাগতিয় সব চাহত অস হোয়।
গোদ লিয়ে হুলসী ফিরৈ, তুলসী সো সুত হোয়।।

বিদেশি শাসক, আকবরের সেনাপতি, বহু যুদ্ধজয়ী আবদুর রহিম যে আন্তরিকতায় তুলসীদাসের জীবন-যন্ত্রণা উপলব্ধি করেছেন, সেই আন্তরিকতার ছিটেফোঁটা সমসাময়িক হিন্দু-ব্রাহ্মণদের ছিল না, মঠাধীশ মহান্ত-মহারাজদের কথা আর না-ই বা বললাম।

তথ্যসূত্র ও ছবি : শ্রীরামচরিতমানস, অন্তর্জাল

BANGLADARSHAN.COM

॥দ্বিতীয় পর্ব॥

তুলসীদাস শুধুমাত্র কবি ন'ন। তিনি ছিলেন একটি বিস্তীর্ণ সভ্যতার বিবর্তিত মূল্যবোধের মনোস্তাত্বিক প্রতিনিধি। এদেশে মধ্যযুগে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিশ্বাসস্থল, সনাতনধর্মের স্রোতে বিরাট বাঁক নেওয়া বিবর্তনের একজন পথিকৃৎ। ব্রাহ্মণ্যধর্মের চেনা সমাজব্যবস্থার ছকটা আদি শংকরের সময় থেকে তিন চারশো বছর ধরে নিষ্প্রাণতার শিকার হয়ে পড়ছিল। তাকে উদ্ধার করার জন্য যেসব মানুষেরা বড় উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তুলসীদাস ছিলেন তার অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ তুলসীদাস সম্বন্ধে বলেছিলেন: ".....the greatest man of his age in India and greater than even Akbar himself." বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ জর্জ গ্রিয়ার্সন বলেছিলেন, "the greatest leader of the people after the Buddha" এবং "the greatest of Indian authors of modern times" (Notes on Tul'si Das)।

গল্পটা শুরু হবে আচার্য রামানুজের সময় থেকে। বেদান্ত অর্থাৎ মূলত উপনিষদের শিক্ষার পথেই শতধাবিভক্ত ভারতীয় লৌকিক ধর্মবিশ্বাস, অর্থাৎ শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর বা শাক্ত ইত্যাদি মতবাদী মানুষদের একটি ছাতার তলায় আনার কূট অধ্যাত্ম-রাজনৈতিক প্রয়াস শুরু হয়েছিল কালাডির আদি শংকরাচার্যের কুশল নেতৃত্বে। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ রামানুজ সনাতন অধ্যাত্মদর্শনের স্তম্ভ আদিশংকরের পর প্রধানতম ধর্মীয় দিগদর্শক ছিলেন এদেশের। শংকরের অদ্বৈত বেদান্তবাদী ভাবধারার পরবর্তী মান্য নায়ক ছিলেন তিনি। সৃষ্টি করেছিলেন শ্রী সম্প্রদায়। শংকরের মোক্ষবাদী দর্শনকে বিবর্তিত করে প্রস্তাব করেছিলেন বিশিষ্ট অদ্বৈত দর্শনের। যার ছিল তিনটি উৎস ধারা, নাম প্রস্থানত্রয়ী। উপনিষদ, ভাগবদগীতা এবং ব্রহ্মসূত্রের সারসংক্ষেপকে সম্মিলিত করেছিলেন অদ্বৈতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন বৌধায়ন, টঙ্ক, গুহদেব, দ্রামিড় প্রমুখ। এর মধ্যে বৌধায়ন ছিলেন পূর্ব মীমাংসা অথবা মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তের এক জন প্রবাদপ্রতিম ব্যাখ্যাকার। স্বামী রামানন্দ ছিলেন সম্ভবত প্রয়াগের মানুষ। কিন্তু তাঁর কর্মভূমি ছিলো বারাণসী। পরবর্তীকালে তিনি বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের শিক্ষা নিতে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেছিলেন। দীর্ঘকাল সেদেশে রামানুজপন্থী গুরু রাঘবানন্দের কাছে শিক্ষা নিয়ে ফিরে আসেন বারাণসীতে। কিন্তু তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতায় পর্যুদস্ত বারাণসীর অধ্যাত্ম আবহে তিনি স্বস্তি পাননি। নাথপন্থী যোগীদের সংস্পর্শে এসে ঔপনিষদিক অদ্বৈতবাদ ও লৌকিক বৈষ্ণব চেতনার সংশ্লেষণে প্রবর্তন করেন ভক্তিবাদী আন্দোলনের রূপরেখা। মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচেতনার জলবিভাজক আন্দোলন ছিল সেটি। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমবাদী প্রস্তাবনার বিপরীত মেরুতে ইতর মানুষের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার উত্তর হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল ভক্তি আন্দোলনের উদ্বেল ধারা। পঞ্চনদ থেকে বঙ্গদেশ, সর্বত্র।

সনাতনপন্থীদের মধ্যে রামানন্দই এদেশে প্রথম একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করেন, রামানন্দি সম্প্রদায়, যেখানে বর্ণবাদ আমল পায়নি। একটি বিখ্যাত দোহা, যা পরবর্তীকালে রামানন্দের বিশ্রুত শিষ্য সন্ত কবীরের নামেই অধিক প্রচলিত, তাঁর নবদর্শনের ভিত্তি ছিল।

BANGLADARSHAN.COM

“জাতি না পুছো সাধো কী, পুছ লিজিয়ে জ্ঞান,
মোল করো তলওয়ার কো, পড়া রহন দো ময়্যান॥”

অর্থাৎ সাধুর কোনও জাতি হয় না। তার জ্ঞানই তার পরিচয়। যেমন তলওয়ারের পরিচয় তার ধারে, খাপের ভূমিকা সেখানে অর্থহীন। মানুষের জন্মগত জাতিগত পরিচয় ঐ খাপের মতো। অর্থহীন। সেকালে একজন ব্রাহ্মণ্যসামর্থ্যের প্রতিভূ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের এই অবস্থান শুধু দুঃসাহসীই নয়, যুগান্তকারী। রামানন্দ ছিলেন ক্রান্তদর্শী। তিনি বুঝেছিলেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভারতীয় সনাতনবাদী বিপুল জনসমষ্টিকে যদি নবধর্ম ইসলামের বিধ্বংসী প্লাবনের থেকে রক্ষা করতে হয়, তবে নিম্নবর্গীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে ধর্মের মূলস্রোতে নিয়ে আসতে হবে। এর একমাত্র পথ বর্ণাশ্রমের বিভেদবাদী নীতি থেকে সরে এসে ভালোবাসার সনিষ্ঠ আবেগকে আশ্রয় করা। যে নীতির প্রয়োগ আমরা আরও পাঁচশো বছর আগে ইসলামে মহাত্মা আলির অনুগামীদের মধ্যে দেখেছি। যাকে পরবর্তীকালে সুফিধর্ম বলা হয়েছে। রামানন্দ এক্ষেত্রে বৈদান্তিক ঈশ্বরের ভূমিকা অপসারণ করে ‘হরি’কে আশ্রয় করলেন। এই হরি, কখনও রাম, কখনও বা কৃষ্ণ। তিনি কোনও রক্তচক্ষু প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবতা ন’ন। নিতান্ত ঘরের লোক, প্রাণের আরাম। রামানন্দের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে যেমন ছিলেন ব্রাহ্মণ অনন্তানন্দ, ভবানন্দ, সুখানন্দ, তেমনই ছিলেন ম্লেচ্ছ ও ‘অচ্ছুত’ কবীর, রবিদাস, সেনা, সধনা ও ধন্না। ছিলেন সেকালের বিচারে প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে দু’জন নারী সাধিকা সুরসরি ও পদ্মাবতী। বহুদিন পরে আমাদের বাংলার সাধক লালন সাঁইয়ের লেখায় যেমন পাই,-

BANGLADARSHAN.COM

“ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে কোনও জাতের বিচার নাই।”

যদিও আচার্য রামানুজের শিষ্য বল্লভাচার্য এবং নিম্বার্ক বৈষ্ণব ভক্তিবাদের পূর্ববর্তী পরিচিত প্রবক্তা ছিলেন, কিন্তু রামানন্দই ছিলেন এদেশে ভক্তি আন্দোলনের মূল স্রোতের প্রধান ভগীরথ। ভক্তি আন্দোলনকে একটা জন-আন্দোলনের আকার দেবার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রামানন্দ। যে নামগুলি আগে করলাম, তাছাড়াও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক, সন্ত জ্ঞানদেব, সন্ত নামদেব, সন্ত তুকারাম, সন্ত নাভাদাস, সন্ত একনাথ এবং আমাদের একান্ত বাঙালি শ্রীচৈতন্য। রামানন্দের প্রস্তাবিত সংস্কারগুলির মধ্যে প্রধান,-

১. আরাধ্য ঐশী লক্ষ্যলাভে জন্মগত জাতি বা বর্ণভেদ কোনও বাধা হবে না,

২. যাবতীয় আরাধনা পদ্ধতির মধ্যে লৌকিকতার জটাজাল যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। ভক্তি ও নিষ্ঠাই একমাত্র শর্ত,

৩. ‘ধর্মে’র নামে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কারকে দূর করতে হবে,

৪. পণ্ডিত-পুরোহিত, মুল্লাহ-ইমাম ভিত্তিক লোকাচারকেন্দ্রিক অধ্যাত্মসন্ধান বিসর্জন দিয়ে ঐশী লক্ষ্যের সঙ্গে সরাসরি হৃদয়বন্ধন করতে হবে,

৫. সমস্ত উপাসনা বা আরাধনার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। সাবেকি সংস্কৃতভিত্তিক ব্রাহ্মণ্য আচারানুষ্ঠান গ্রাহ্য হবে না।

'তুলসী'কে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ভক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটটি জানা বিশেষ জরুরি। রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে সগুণ ও নির্গুণব্রহ্ম, উভয় মতেরই সাধকেরা ছিলেন। রামানন্দ নিজে কিন্তু সগুণ বা নির্গুণ কোনও মতের প্রতিই প্রত্যক্ষ পোষকতা করতেন না। তাঁর জন্য ভক্তির গভীরতাই একমাত্র বিবেচ্য। তাই কেউই তাঁর বৌদ্ধিক আশ্রয় থেকে প্রত্যাখ্যাত হতেন না। তাঁর বিখ্যাততম শিষ্য সন্ত কবীর ছিলেন নির্গুণপন্থী। আবার ভবানন্দ বা সুখানন্দ ছিলেন সগুণব্রহ্মের পক্ষপাতী। একটা উল্লেখযোগ্য সমীকরণ লক্ষ করা যায় এই বিভাজনের মধ্যে। ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত জন্মগত ব্রাহ্মণদের মধ্যে সগুণপন্থী সাধকরা সংখ্যাগুরু। আবার ইতরবর্গীয় সাধকেরা ছিলেন মূলত নির্গুণপন্থী। সগুণপন্থীরা উপাস্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন হয় রাম (তুলসীদাস) বা কৃষ্ণকে (সুরদাস)। রাম ও কৃষ্ণ, দুটি প্রতীকই সগুণ মনুষ্যমূর্তিতে কল্পিত হ'ন। নির্গুণপন্থীর আরাধ্য ছিলেন একটি ধারণা। যাঁর নাম শুধু 'হরি'। তিনি নিরাকার, নির্গুণ, নিরঞ্জন ও অখণ্ড। তবে একথাও সত্য, তুলসী নির্গুণপন্থী সাধকদের মতো বর্ণাশ্রমবাদী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি কোনও অবস্থাতেই 'বেদোক্ত' বর্ণবাদী অনুশাসনের বিরুদ্ধে যাবার সাহস দেখাতে সক্ষম হননি। এই নিয়ে অভিযোগও রয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

ভক্তি আন্দোলনের পুরোধা সমস্ত সাধকই কাব্য ও সঙ্গীতচর্চার মাধ্যমে নিজস্ব মতবাদ প্রচার করতেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের কবিত্বশক্তি তো ঈর্ষণীয়ভাবে আকাশছোঁয়া। কিন্তু গোস্বামী তুলসীদাস ছিলেন সবার মধ্যে অনন্য। তাঁর কবিত্বশক্তির গভীরতা ও প্রভাব অতি বিপুল। আধুনিক যে হিন্দিভাষা পরবর্তীকালে লোকস্বীকৃত হয়েছে তার শিকড় ছিলো তুলসীর ব্রজভাষায় রচিত সুবৃহৎ রচনাবলির মধ্যে। তুলসীকে নিয়ে গড়ে ওঠা উপকথা, কিংবদন্তির কোনও শেষ নেই। যদিও এসব গল্পকথা আসলে ভক্তকথা। অর্ধেক কল্পনা, অর্ধেক অতিশয়োক্তি। কিন্তু তা প্রতিষ্ঠা করে তাঁর লোকপ্রিয়তা ও জনজীবনে আকাশচুম্বী প্রভাবকে। যেমন একটি লোককথা দেখা যাক। জন্মস্থান রাজপুর থেকে প্রথমে যখন তুলসী বারাণসীতে আসেন, তখন অস্সিঘাট ছিল একেবারে জনহীন, অরণ্যসংকুল স্থান। তাই তিনি প্রহ্লাদঘাটের কাছে বসবাস করতে থাকেন। সেই সময়েই তাঁর সংস্কৃতভাষায় কাব্য রচনার প্রয়াসও শুরু হয়। তিনি সারাদিন ধরে যা কিছু রচনা করতেন, রাত হলেই তা কোথায় হারিয়ে যেত। এইরকম আটদিন চলার পর কাশীবিশ্বনাথ তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন সংস্কৃতভাষা পরিত্যাগ করে অওধিভাষায় কাব্য রচনা করতে। তাহলেই তুলসীর কাব্য সামবেদের মতো গরিমা অর্জন করবে। এই আদেশটি যখন তুলসীদাসের কাছে এসেছিল তখন তিনি ছিলেন আধো ঘুমে, আধো জাগরণে। আধো তন্দ্রায় তুলসীদাস নিজস্ব ভাষামাধ্যম বিষয়ে যে সিদ্ধান্তটি নেন তার তাৎপর্য ছিল অসীম। সমাজতাত্ত্বিক রূপকের দিক দিয়ে দেখলে মনে হবে, ইতরবর্গের দেবতা শিব স্বাভাবিকভাবেই চাইলেন তুলসীর প্রতিভার ফল যেন শুধুমাত্র বিষ্ণুপূজক সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণসমাজের উপভোগের জন্যই সীমাবদ্ধ না থেকে যায়। ইতর মানুষও যেন এ জাতীয় সৃষ্টির আশীর্বাদ সমানভাবে পেতে পারে। তুলসীর এই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল রামানন্দীয় প্রভাব। যদিও সমপর্যায়ের ক্রান্তদর্শী সিদ্ধান্ত এর আগে আরেকজন মানুষ প্রথম নিয়েছিলেন, শাক্যমুনি বুদ্ধ। সারনাথ থেকে তাঁর প্রথম উপদেশাবলী প্রচার করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন ইতরবর্গের ভাষা,

পালি। উচ্চবর্ণের স্বীকৃত ভাবপ্রকাশের মাধ্যম দেবভাষা নয়। পঞ্চম শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষে আলো-আঁধারির মধ্যযুগ পেরিয়ে আর্য-ব্রাহ্মণ্য-ইসলাম-সুফি-ভক্তিবাদী সমন্বয়ের সুফলসম্পন্ন ক্ল্যাসিক একটা সংস্কৃতিবোধ নির্মাণ হল তুলসীদাসের রচনাবলির মধ্য দিয়ে।

তুলসীদাস রামভক্তি আন্দোলনের প্রধান পুরুষ। রামানন্দ নিজে অনুগামীদের জন্য রাম, কৃষ্ণ বা অলখ নিরঞ্জন কোনও প্রতীকেরই নির্দিষ্ট রূপকল্প তৈরি করে দেননি। তাঁর এই উদার গণতন্ত্রপ্রিয়তা শিষ্যদের সৃজনশীলতার মধ্যে অশেষ বৈচিত্র্য এনে দিয়েছিল। রামানন্দের একমাত্র শর্ত ছিল তাঁর অনুগামীরা নিজের ইচ্ছেমতো ঐশীপ্রতিমা বেছে নিতে পারবেন। কিন্তু সেই আরাধ্যের প্রতি ভক্তি ও প্রেমে একবিন্দু ফাঁকি চলবে না। প্রশ্নহীন প্রেম, ব্যতিক্রমহীন ভক্তিই ছিল এই আন্দোলনের একমাত্র চালিকাশক্তি। সগুণপন্থীদের মধ্যে যেমন ছিল দুটি পক্ষ, রামভক্ত ও কৃষ্ণভক্ত; তেমনই নির্গুণপন্থীদের মধ্যে ছিল দুটি ভার্টিক্যাল। জ্ঞানমার্গী ও প্রেমমার্গী। প্রেমমার্গীরাই পরবর্তীকালে ভারতীয় সুফিধর্মের অনুগামী হয়েছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণ মূলত আর্য ও অনার্য সভ্যতার মধ্যে পরস্পর ধর্ম-সংস্কৃতি, নীতিবোধের টানাপড়েনের ইতিকথা। বাল্মীকির রাম কিন্তু দোষমুক্ত, ঈশ্বরপ্রতিম কোনও অধিনায়ক নন। তিনি একজন আর্য রাজপুরুষ। মহৎ, কিন্তু রজোগুণ সম্পন্ন একজন মানুষের যা কিছু দোষ-গুণ থাকে, তাঁর মধ্যে সব কিছু রয়েছে। সারাজীবনে তিনি বহুবার ন্যায়ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। যে কোনও সাধারণ মানুষের মতোই। কিন্তু তুলসী এই রামচরিত্রটিকে সৃষ্টি করলেন ‘মর্যাদা পুরুষোত্তম’ হিসেবে। যিনি মনুষ্যরূপেও বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার। একজন আদর্শ যোদ্ধা, পুত্র, ভ্রাতা, পতি, বন্ধু ও নৃপতি। তাঁর সবকিছুই শ্রেষ্ঠ। কোনও দোষ থাকতে পারে না। আমাদের পরিচিত নানা মানুষী দুর্বলতায় বিড়ম্বিত, খণ্ডিত রাজপুরুষ রাম চরিত্রটির প্রেক্ষিত বদলে দিয়েছিলেন তিনি। রাম তাঁর কাছে একজন লোকনায়ক। যিনি শূদ্রা শবরীর নিবেদিত উচ্ছিষ্ট ফল ভোজন করতে দ্বিধা করেন না। বাল্মীকির রামচরিত্রের যা কিছু ক্লিষ্ট লক্ষণ সব কিছুকে ভক্তি ও আনুগত্য দিয়ে তিনি ঢেকে দিতে চেয়েছিলেন। এর কিছু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ রয়েছে বলে মনে হয়েছে আমার। নবধর্ম ইসলামে যেমন বার্তাবাহী পয়গম্বরের ভাবমূর্তির মধ্যে কোনও ধূসরতা বরদাস্ত করা হয় না। তাঁর আদর্শ উচ্চতম, প্রশ্নবিহীন। ভাবা হত তার জোরেই তাঁর অনুগামীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও এদেশের বিপুল জনসমষ্টিকে শাসন করার শক্তি অর্জন করতে পেরেছিল। ইসলামের এই দৈবী একনায়কতন্ত্রী নৈতিক অনুপ্রেরণার বিকল্প হিসেবে মধ্যযুগের সনাতনধর্মীয় সেরিব্রাল শিল্পীরা রাম বা কৃষ্ণের ভাবমূর্তিকে গরিমাময় একনায়কতন্ত্রী একটি অবস্থান প্রদান করেন। তুলসীর রামচরিত্র এই চিন্তনেরই প্রকাশ। তাঁর রচনার নাম তুলসীরামায়ণ নয়। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন ‘রামচরিতমানস।’ অর্থাৎ তুলসীদাসের মনোজগতে রামচরিত্র যে মহিমা, গরিমা, সর্বজয়ী নৈতিক শক্তি নিয়ে প্রতীত হয়েছিল, তারই কাব্যরূপ। গত পাঁচ-ছশো বছর ধরে এদেশে যে রামকে মানুষ চেনে, তিনি তুলসীর রাম। মনে রাখতে হবে মহাদেবী বর্মা যেমন বলেছিলেন, আজকের ভারতীয় সমাজব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে তুলসীদাস নির্মিত মূল্যবোধের ভিত্তির উপর এবং আজ ভারত যে রামকে চেনে, তিনি তুলসীর রাম। বাল্মীকির নয়। আজ এই অন্ধকার সময়ে রামের নামে যা কিছু রাজনৈতিক পাপ, হননপর্ব আমরা দেখতে পাই, তার উৎস রয়েছে তুলসীসৃষ্ট সর্বশক্তিমান মর্যাদাপুরুষোত্তম রামচরিত্রের ক্লিষ্ট অপব্যাখ্যার মধ্যে।

BANGLADARSHAN.COM

দীর্ঘকাল ধরে গাঙ্গেয় অববাহিকায় গোস্বামী তুলসীদাস একটি ধারণা, ব্যক্তিবিশেষ নন। মধ্যযুগের প্রধান সন্তদের মতো তাঁর সম্পর্কেও অগণিত কিংবদন্তি, লোককথা বা কল্পিত আখ্যান প্রচলিত আছে। তাঁর ব্যক্তিজীবন নিয়ে এত ধরনের ভিন্নমুখী বর্ণনা রয়েছে যে কোনটি স্বীকৃত সত্য, কোনটা বা গল্পকথা ঠাহর হয় না। চার-পাঁচটি জন্মসন, প্রায় ততগুলো জন্মস্থান নিয়ে লোকে নিজেদের মধ্যে বচসা করে। তবে সরকারিভাবে এখন ঘোষণা করা হয়েছে ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে চিত্রকূটের কাছে রাজপুর গাঁয়ে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের বিশিষ্ট ভক্তকবি ও পণ্ডিতেরা তাঁকে নিয়ে যত লিখেছেন, ভারতবর্ষের আর কোনও সারস্বতসাধকের তা নসিব হয়নি। আমার নিজের ধারণায় বঙ্গদেশে বিশের শতকে যে মাত্রায় আমরা নিজেদের জীবনচর্যা ও যাপনবৃত্তে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছি, তিন-চারশো বছর ধরে তুলসীদাসকে বিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় ভূভাগের আপামর মানুষ সেই মাত্রার গুরুত্ব ও প্রেয়ত্ব সহকারে গ্রহণ করে এসেছে। ব্রাহ্মণ্যচিন্তার বহুমুখী গভীরতা ও ঐশ্বর্য এবং ভক্তিবাদের প্রেম অনুভূতি, এই দু'টির সমন্বয়ে তুলসীদাস একটা স্বীকৃত মূল্যবোধের জনক। এই মূল্যবোধটি আজকের বিচারে হয়তো সামন্ততন্ত্র ও পিতৃতন্ত্রের ইশারা বহন করে আনে। কিন্তু ইতিহাসের বিচার সতত স্থান-কাল ও পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতেই করতে হয়। সেই দৃষ্টিকোণে তুলসীদাসের অন্তর্দৃষ্টি ছিল গভীরভাবে মানববাদী। জীবনকথার নানা ইঙ্গিত বিভিন্ন সময়ে তাঁর রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। কিংবদন্তির স্ফীত আবরণের ফাঁক দিয়ে তার সত্যবস্তু খুঁজে নেওয়া একটি চ্যালেঞ্জ। তবে এটা স্বীকৃত সত্য, যে সম্ভবত ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নিলেও তিনি ছিলেন আজন্ম দরিদ্রতম, নিপীড়িত ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। তাঁর পিতা-মাতা হিসেবে যাঁদের নাম পাওয়া যায়, আত্মারাম দুবে ও হুলসি দেবী (কেউ বলেন তাঁরা সরযূপারিন, কেউ বলেন কনৌজিয়া) পুত্রের জন্মের সময় গ্রহনক্ষত্রের কিছু অশুভ যোগাযোগ থাকায় সদ্যোজাত সন্তানকে পরিত্যাগ করেন। শিশুটি পালিত হয় চুনিয়া নামে এক অন্ত্যজ নারীর আশ্রয়ে। শিশুটি প্রথম যে শব্দটি উচ্চারণ করে, তা ছিল 'রাম'। তাই লোকে তার নাম দিয়েছিল 'রামবোলা'। এই তথ্যটি তিনি নিজে বিনয়পত্রিকায় লিখে গেছেন। শিশুটি মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে আবার অনাথ হয়ে যায় পালিকামাতার মৃত্যুতে। সেই বয়স থেকেই তাঁকে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। এই রকম কোনও একটা সময়ে রামানন্দস্বামীর শিষ্য সাধক নরহরিদাস তাঁকে আশ্রয় দেন। তুলসীদাসের শিক্ষাদীক্ষা এই গুরুর কাছেই শুরু হয়। সম্ভবতঃ সাত বছর বয়সেই তিনি সাধুব্রত গ্রহণ করেন। রত্নাবলীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ, পুত্রের জন্ম, পত্নীর ভৎর্সনায় গৃহত্যাগ ইত্যাদি আখ্যান পরবর্তীকালে কল্পিত হয়েছিল। গুরুর মৃত্যুর পর তিনি আবার রাজপুরে ফিরে যান এবং শুধুমাত্র রামকথাই তাঁর অবলম্বন হয়ে ওঠে। সারা জীবন তিনি আর্থিকভাবে হতদরিদ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধি হয়েই জীবন কাটিয়েছেন।

BANGLADARSHAN.COM

শুধু অওধি নয়, সঙ্গে সঙ্গে ব্রজভাষাতেও তিনি সমানে কাব্য রচনা করে গেছেন। এই দুটি ভাষার পাঠকগোষ্ঠী আলাদা। তাঁর লক্ষ্য ছিল সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া। তাঁর মাথার উপর রাম বা শিবের আশীর্বাদ ছিল কি ছিল না তা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু সম্পূর্ণ গাঙ্গেয় উপত্যকার মানুষের ভক্তিভালোবাসা অঝোরধারে তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছিল। রামচরিতমানসের (মানস) দু'টি মূল পাণ্ডুলিপি প্রায় অবিকৃত, উদ্ধার হয়েছে। তাই এই কাব্যটিতে অন্য কোনও কবির বিক্ষিপ্ত অংশযোজনার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তুলসীদাসের কাব্য পারদর্শিতা নিয়ে সারা পৃথিবীর পণ্ডিত ও পাঠকদের মধ্যে কোনও দ্বিধা নেই। ১৫৭৫

খ্রিস্টাব্দের রামনবমীর দিন এই কাব্য তিনি লেখা শুরু করেন। শেষ হয় ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দের বিবাহপঞ্চমী'র দিন। এতে ১২৮০০ পংক্তি আর ১০৭৩টি চৌপাই বা স্তবক রয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণের মতোই সাতটি কাণ্ড এবং সামগ্রিকভাবে ১৮ রকম ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তার মধ্যে দশটি শাস্ত্রীয় সংস্কৃত ছন্দ ও আটটি প্রাকৃত ছন্দ। ভারতবর্ষের কোনও কাব্যে ছন্দ নিয়ে এত ব্যাপক পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়নি। মধ্যযুগের অন্যান্য প্রধান সাধক ও দীপস্তম্ভ, যেমন কবীর, নানক, রহিম, নামদেব, রামদাস প্রভৃতির থেকে তুলসী ছিলেন বিশেষভাবে আলাদা। কারণ অধ্যাত্মসাধনার বিশাল পরিধিকে ছাপিয়ে গিয়েছিল তাঁর কাব্যশক্তির মহিমা।
ভারতীয় জনমানসে তুলসীদাসের দিগদর্শন ও প্রভাব এখনও সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী। যদি কেউ সন্ধান করে তবে উত্তরভারতের বিস্তৃত প্রত্যন্ত গ্রামে-প্রান্তরে তার প্রমাণ পেয়ে যাবে আজকের দিনেও। ঐ পর্যায়ের একজন ধীমান স্রষ্টা কিন্তু নিবেদিত ছিলেন লোকজীবনের মূল শিকড়ের প্রতি। অসংখ্য কাল্ট, গোষ্ঠী, স্বার্থসন্ধ দল-উপদলে বিভক্ত মধ্যযুগের ভারতবর্ষে একটা স্বীকারযোগ্য রোলমডেল না থাকলে যে সব নিপীড়িত দরিদ্র মানুষের নৈতিক শক্তি ধ্বস্ত হয়ে যাবে সেটা তুলসীদাস হৃদয় দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট রাম নৈতিক শক্তির বাতিঘর। অন্ধকারে ডুবে থাকা মানুষ সেই দিকে তাকিয়ে জীবনের নৌকো বেয়ে যেতে পারে।
২০১৭'র বিশ্বদৃষ্টি দিয়ে তুলসীদাসকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' ফতোয়া দেবার মধ্যে নানা বিপদ আছে। মৃত্যু ও ইতিহাসের অভিঘাত নিয়ে নানামুখী ব্যাখ্যা চলতে পারে। কিন্তু তাদের কখনও অস্বীকার করা যায় না। উনিশ শতকে ফ্রেডরিক গ্রাউস সাহেব ইংরিজিতে অনুবাদ করেছিলেন রামচরিতমানস। তিনি বলেছিলেন সমগ্র 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'তে, কলকাতা থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত এই গ্রন্থের মতো প্রভাব ও অভিঘাত অন্য কোনও সাংস্কৃতিক সৃষ্টির নেই। তখনই রচনাটি পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভিনসেন্ট স্মিথ তো অনেক অভিভূত মন্তব্য করেছিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

".....not merely as the greatest modern Indian epic, but as something like a living sum of Indian culture.....the tallest tree in the magic garden of medieval Hindu poesy," (Akbar: The Great Mughal-Smith)।

গান্ধিজি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছিলেন, "the Bible of Northern India.....the best and most trustworthy guide to the popular living faith of its people." (Gandhi-Autobiography)। সন্ত নভদাস তুলসীর জীবৎকালেই 'শ্রীভক্তমাল' গ্রন্থে বলেছিলেন তুলসী আসলে বাল্মীকির অবতার। নবযুগে মানুষের কাছে নতুনভাবে রামায়ণকে প্রস্তুত করতে আবির্ভূত হয়েছেন। এহ বাহ্য, আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী জেনেছি বঙ্গভাষীরা ব্যক্তিত্ব হিসেবে তুলসীদাস বা সৃষ্টি হিসেবে রামচরিতমানসকে নিয়ে বিশেষ ওয়কিফহাল নন। এই মুহূর্তে যখন 'রাম' নামক পৌরাণিক চরিত্রটির ছায়ার আড়ালে মানুষের মুক্তচিন্তার উপর ক্রমাগত অস্ত্রাঘাত হয়ে চলেছে, তখন তুলসী ও তাঁর রাম আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছেন। রাজনীতির এঁটে দেওয়া ভয়ের মুখোশটি ছিঁড়ে ফেলে 'রামে'র পরিচয় জানতে চাইলে তুলসীর হাত আমাদের ধরতেই হবে। হয়তো একটু ফিলমি শোনাবে, কিন্তু এই সব গোমূর্খদের বলতে ইচ্ছে করে, "রাম কা নাম বদনাম না করো..."
তুলসীদাসজীর লেখা শিববন্দনা:

শঙ্কর মহাদেব দেব সেবত সুর যাকে
ভষ্ম অঙ্গ শিস গঙ্গা, বয়েল বাহন অতি প্রচণ্ড
গৌরী অর্ধাঙ্গ সঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ জাকে।
লপটি ঝপটি যাও ব্যাল
অউর ওরো বাঘছাল
রুন্ড মালা চন্দ্র ভাল দৃগবিশাল জাকে।
পাবত নেহি পার শেষ
নারদ শারদ সুবেশ গাবত গুণীজন গণেশ
ব্রহ্মাদিক জাকে।
ধ্যাবত দ্বিজ তুলসীদাস, গৌরীপতি চরণ আশ
এইসো হর ভেষ ধরহী, ভক্তি হেতু জাকে।

তুলসীদাসজীর লেখা গণপতি বন্দনা:

রুনক ঝুনক পগ নেবার বাজে গজানন্দ নাচে
পিতা তুমহারে হ্যায় শিবশঙ্কর নন্দীশ্বর রাজে,
মাতা তুমহারি হ্যায় শ্রীগিরিজা শৃঙ্গ চড়ি গাজে।
শুন্ড শুন্ডালা দুন্দ দুন্দালা একদণ্ডী রাজে,
গলে পুষ্পন কা হার বিরাজে কোটিকাম লাজে,
নিধন নিবারণ সবসুখ কারণ রাজনৃপতি রাজে,
তুলসীদাস গণপতি কো সুমিরে দুখ দারিদ ভাজে।

BANGLADARSHAN.COM

সবশেষে এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা লিখে শেষ করবো তুলসীদাসজীর পুণ্য জীবনের অনুধ্যান। কৃষ্ণসাধিকা মীরাবাঈ তাঁর পারিবারিক সংকটে পড়ে একবার পরামর্শ চেয়েছিলেন তুলসীদাসজীর কাছে, মীরাবাঈজীর চিঠি আর তুলসীদাসজীর উত্তর দুটোই দেওয়া হলো সকলের অবগতির জন্য।

মীরাবাঈ চিঠি লিখছেন পরামর্শ চেয়ে তুলসীদাসজীর কাছে, মীরাবাঈজীর চিঠির বয়ান ছিল এটা:

স্বস্তি শ্রী তুলসি সুখনিধান দুখ হরণ গোসাঁই,
বারমবার প্রণাম করাহু, অব হরহু শোকা সমুদাই,
ঘর কে স্বজন হামারে জেতে সবহু উপাধি বড়াই,
সাধু সঙ্গ আর ভজন করত মহিম দেতা কলেশা মহাই,
বালাপানাতে মীরা কিনহি, গিরিধরলালা মিতাই,
সো তোম অব ছুটোই নেহিম কয়মহুম,
লাগি লগান বরিয়াই
মেরে মাতাপিতা কে সমহও, হরিভক্তনহা সুখ দায়ী,

হামকো কাহা উচিত কারিব হ্যায়, সো লিখিয়ে সমুঝাই।

(মীরার চিঠি গোস্বামী তুলসীদাসজীকে)
অর্থ-স্বস্তি শ্রীতুলসীদাসজী, পরম উপকারী ও আশিস ও আনন্দের উপকারকারী, আপনার শ্রীচরণে বারংবার আমি প্রণাম করি, দয়া করে আমার অসীম দুঃখ ও কষ্টের অবসানের রাস্তা দেখান।

আমার শ্বশুরবাড়ির পরিবারের সবাই, যারা যারা আমার বাড়িতে আছেন, তারা সর্বদা অতি সমস্যা তৈরী করছেন আমার সন্তদের সাথে মেলামেশা ও ভজন কীর্তন নিয়ে যা আমাকে ভীষণ দুঃখিত ও বিষন্ন করছে। সেই শৈশব থেকে আমার গিরিধারিলালের সাথে বন্ধুত্ব যা এখন এমন হয়েছে যে সেটা ভাঙ্গা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমার চোখে হরিভক্তরা আমার মা বাবা/অভিভাবক সম, সেইজন্য আমি আপনার কাছে পরামর্শ চাইছি আমার কী করা উচিৎ।

তুলসীদাসজী তাঁর যে উত্তর দিয়েছিলেন তাঁর বিনয় পত্রিকা কাব্যগ্রন্থে এভাবে আছে যা আবার একটি জনপ্রিয় ভজনও:

BANGLADARSHAN.COM

জাকে প্রিয় না রাম বৈদেহী
সো ত্যাজি কোটি বৈরী সম যদ্যপি পরম সনেহী।
ত্যাজো পিতা প্রহ্লাদ বিভীষণ ভরত বন্ধু মহাতারি
বলি গুরু ত্যাজো, কান্ত ব্রজ বলিতানি
ভয় মুদ মঙ্গলকারী।
নাতে নেহ রামকে মনিয়াত সুহৃদ সুসেব্য জাহালো
অঞ্জন কাহা আঁখি যেহি ফুটে বহুতক কাহো কাঁহা লো
তুলসী সো সব ভাতি পরম হিত পূজ্য প্রাণেতে প্যারো
যাসো হোয়ে পরম রাম পদ - এতো মতো হামারো।

অর্থ-যাদের রাম ও সীতা প্রিয় নন, তাদেরকে ত্যাগ করো, যদি তারা তোমার খুব ঘনিষ্ঠ ও ভীষণ প্রিয়ও হয়, তবুও কারণ তারা কোটি শত্রুসম।

বিষ্ণুর জন্য প্রহ্লাদ তার পিতা হিরণ্যকশিপুকে ছেড়েছিল, তেমনই বিভীষণ ত্যাগ করেছিল ভাই রাবণকে, আর ভরত ত্যেজেছিলেন মা কৈকেয়ীকে।

দৈত্যরাজ বলি ত্যেজেছিলেন গুরু শুক্রাচার্য্যকে আর গোপীরা ত্যাগ করেছিলেন তাদের স্বামীদের কৃষ্ণর দিক নেবার জন্য আর তাই তারা হয়ে আছেন পবিত্রতা ও আনন্দময়তার সূত্র ও প্রতীক।

যেকোনো সুহৃদ, আত্মীয়, পরিজন ততক্ষন প্রিয় থাকেন (সুসেব্য) যতক্ষণ তাদের কাছে রামের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা থাকে সেই নিরিখে। (রামের প্রতি ভালোবাসার নিরিখে সব আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু প্রিয় হয়)। কাজলের (অঞ্জন) কী ভালো গুণ প্রয়োজন যদি তা আঁখিকে অন্ধ করে দেয়!

যে রামচন্দ্রের (তোমার ইষ্টের) চরণকমলের প্রতি তোমার প্রেম বর্ধন করতে পারে, সেই তোমার পক্ষে উপকারী, পূজনীয় এবং প্রিয় হওয়ার যোগ্য নিজেদের প্রাণের চেয়েও, এটাই আমার মত।মীরাবাঈ ছিলেন রামানন্দী সম্প্রদায়ের ভক্ত এবং গুরু রবিদাস (রুইদাসজীর) শিষ্য।

জয়তু তুলসীদাসজী, তাঁর পুতঃ পবিত্র চরণে শতকোটি বিনম্র প্রণতি জানাই রামচরণে মতি হয় যেন তাঁরই মত তাঁরই কৃপায় ।🙏🙏🙏
শুভমস্তু

BANG COM

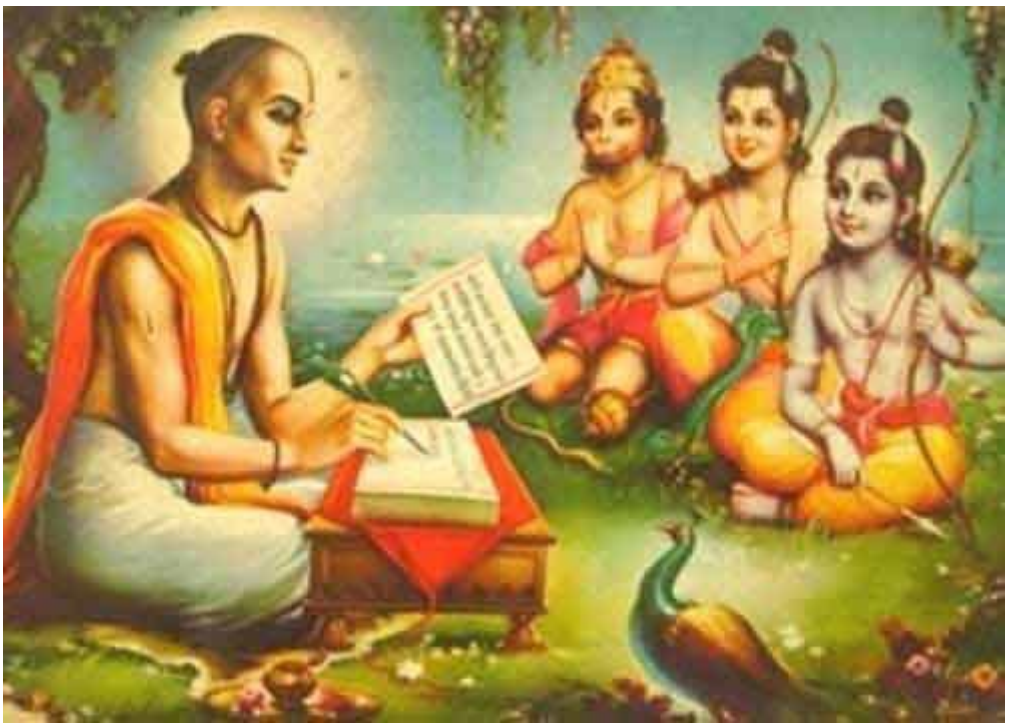

BANGLADARSHAN.COM

BAN OM

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥